ডুয়ার্সের মূল পর্যটন কেন্দ্র গোরুমারার হাল হকিকৎ

উৎসবের আনন্দ ফিকে এখন চা বাগানে?

পুজো স্পেশাল: উপন্যাস মেঘের পর রোদ

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার নির্বাচিত ছবি

এখন ডুয়ার্স

উৎসব সংখ্যা ২০১৭। ১২ টাকা

ayurveda

The Science Of Life

Divyaur®

PHARMAKRAFT®
Crafting Wellness

Launching

Ayurvedic Range of Products

Divyaur® (A Division of PHARMAKRAFT®)

PHARMAKRAFT THERAPEUTICS PVT. LTD.

For Distributorship Please Call : 8697773093 (10.30 am to 6 pm)

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

আসছে দুর্গাপুজো। দোকানে দোকানে উপছে পড়ছে নতুন পোশাক কেনার ভিড়। জলপাইগুড়িও সেজে উঠেছে নতুন সাজে। করলা নদীর দু'ধার বাঁধিয়ে দিয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ ইতিমধ্যেই এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। নদীর স্বস্তি। সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি চলছে স্পোর্টস ভিলেজের কাজ। করলা নদীর তীরে আন্তর্জাতিক মানের স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, যা জলপাইগুড়িকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবে বলে আশা করা যায়। শহরের মধ্যেও নদীর সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হবে শিগগিরিই। মার্চেন্ট রোডে আর হসপিটালের রাস্তায় দু'ধারে ফুটপাত হওয়ায় পথ চলতি মানুষজনসহ দোকানদারেরাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, অন্তত দু'চাকাগুলো রেখে একটু বাজার করে নেবার তো একটা গতি হল। করলা নদী নিয়ে শহরের মানুষের একটা আলাদা আবেগ কাজ করে। দুর্গা ঠাকুর এবং তার সন্তানদের বিসর্জনের সময় খুলে নেওয়া হবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, মুকুট, গয়না ইত্যাদি, কারণ ওসব বইবার ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে করলা। মিউনিসিপ্যালিটি সে কথা বোঝে। তাই অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থেরও যাতে একটা হিল্লে করা যায়, তাই ১ কোটি টাকা খরচ করে দুটি কম্প্যাক্টর আনানো হয়েছে। শহরের সমস্ত নোংরা যাতে কমিয়ে আনা যায়, তাতে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ারও যেমন সুবিধে তেমনই একবারে অনেক বেশি বর্জ্য সাফও করে দেওয়া যাবে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার, নগর উন্নয়ন দপ্তর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সকলের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি সুষ্ঠভাবে তাদের কাজ করে চলেছে। পৌরসভার তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

SAWDAGAR RESORT & RESTAURANT

BEST PLACE FOR YOUR DREAM HOLIDAYS

Google

Sawdagar RESORT RESTAURANT

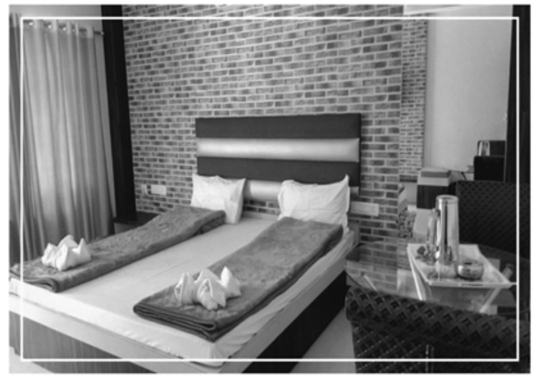

- **Spacious Room with king size bed.**
- **Balcony**
- **Air conditional Room**
- **Intercom facility**
- **Tea maker with required amenities**
- **Spacious bathroom**
- **24hrs. Hot & Cold water**
- **Free Wi-fi Zone**
- **Personal parking area**
- **AC Restaurant**
- **Package tour programme**
- **Car on rental**
- **Gorumara National Park with in 50mtr. From our resort**
- **We are 24 hr. With you**

Booking Open

goibibo.com · BOOKING.COM · tripadvisor · travelguru · make my trip · trivago Hotel Manager · yatra.com · redBus.in

Contact : 03561-266550 (Front Office)
+919679074528/+919434406002 (Front Desk Manager)
Email : sawdagarresort2016@gmail.com Web : www.sawdagarresort.com

Gorumara National Park, Lataguri, Jalpaiguri-735219

চতুর্থ বর্ষ, ১২ সংখ্যা,
১৬ সেপ্টেম্বর -১৫ অক্টোবর ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
গোরুমারার পর্যটন ৬
চায়ের ডুয়ার্স ১৬
কোথায় হারিয়ে গেল সেই আনন্দের দিনগুলি? পুজোর মুখেও চা-বাগানগুলি ঘিরে কেবল হতাশা!
উত্তরপক্ষ ৩৩
প্রাক্ পূজা ডুয়ার্স পরিক্রমা
সমকালীন কাহিনি
মেঘের পর রোদ ৪৩
মোবাইল ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ছবি ৬৮
কলম সিং-এর ডুগালবাবা উপাখ্যান ৭৫
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২০
লাল চন্দন নীল ছবি ২৪
তরাই উৎরাই ২৮
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩০
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৩৭

সম্পাদকের ডুয়ার্স

উত্তরের আমরা কি কুম্ভকর্ণের উত্তরসূরি?

আমাদের উত্তরবাসীদের আচরণ বিশেষ করে গত মাসাধিক কাল ধরে উত্তরের প্রায়-বিচ্ছিন্ন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অদ্ভুত নির্বিকারত্ব ভেতরে ও বাইরে এই এক প্রশ্ন তুলছে বারবার, এবং এমন পরিস্থিতি নাকি নৃতত্ত্ববিদদেরও নতুন গবেষণার অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে তুলেছে বলে কেউ কেউ গোপন খবর পেয়েছেন! তা না হলে ভারতীয় রেল দপ্তর গত ১২ অগস্ট জলে ভেসে যাওয়া ছোটখাটো একটি সেতু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ‘দিনরাত অক্লান্ত লড়ে’ মেরামতির পরেও গত এক পক্ষ ধরে বারংবার চালু হওয়ার ঘোষণা করছেন এবং বারবার তা পিছিয়ে দিচ্ছেন কোন সাহসে? আশায় আশায় যাত্রীরা বারবার টিকিট করছেন, বারবার তা বাতিল হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, ক্ষতি হচ্ছে পুজোর বেচাকেনায়, সীমাহীন ক্ষতি হচ্ছে ডুয়ার্সের ভরা মরশুমের পর্যটন বাণিজ্য। অথচ সেই ভুক্তভোগীরা একে যদি ফাজলেমি বা অকর্মণ্যতা আখ্যা দিয়ে ঝড় না তুলতে পারে তবে বুক ধুকপুক রেলসাহেবদের মনে খানিক তো বল আসবেই, স্পর্ধা তো বাড়বেই!

রেল দপ্তরের এই দীর্ঘসূত্রী ‘মস্করা’ মেনে নেয়নি প্রতিবেশী আসাম, তাই তাদের তিনখানা ট্রেন চালু হয়ে গিয়েছে। চালু হয়েছে এ রাজ্যের রায়গঞ্জের ট্রেনও। কিন্তু অবাক কান্ড নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার বা নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে যে সাত-আটটি ট্রেন রোজ চলে সেগুলির একটিকেও আপতকালীন চালু করবার বিবেচনা হয়নি! তেমনই অন্তত একটি ট্রেনকে অবিলম্বে চালানোর দাবিও উত্তর থেকে কোনও দল বা সংগঠন করেননি। ফেসবুক লেখালেখি হলেও তা গণরোষের আকার নেয়নি, কারণ রোষের আগুনে যারা ঘৃতাহুতি দিয়ে থাকেন সেইসব ফড়ে বা নেতারাই এখন যাতায়াত করছেন আকাশপথে, পকেটে যে তাঁদের অঢেল পয়সা! আর ছাপোষা নিরুপায় যারা যাতায়াত করছেন বাসে, তাদের বারুদ তো আগাগোড়াই ভেজা। সে জন্যই যে ট্রেনগুলিতে বছরভর রিজার্ভেশন মেলা দুষ্কর হয়, সেগুলি দিনের পর দিন না চললেও খুব একটা অসুবিধার খবর মেলে না, কোথাও কোনও তাপ-উত্তাপ সৃষ্টি হয় না!

উত্তরের নিরাসক্ততার এই সারসত্য দাদা এবং দিদিরা বিলক্ষণ জানেন। তাই তাঁরা উভয়পক্ষই নিশ্চিন্ত আছেন, এদের নিয়ে অহেতুক ভেবে সময় নষ্ট করবার বা গলা ফাটাবার কোনও মানে নেই। ত্রাণ আসুক বা না আসুক, ট্রেন চলুক বা না চলুক, রাস্তা সারাই হোক বা না হোক, কলে জল আসুক বা না আসুক, বিদ্যুৎ থাকুক বা না থাকুক, এরা চট করে অখুশি হয় না। কখনও ফুটবল, কখনও গণেশ, কখনও বা ইলিশ নিয়ে এরা বেশ কাটিয়ে দিতে পারে দিনের পর দিন। তাঁরা জানেন, কুম্ভকর্ণের এই উত্তরসূরিরা বহুদিন বাদে বাদে যদিও বা কখনও জেগে ওঠে তখন সামনে মন্ডামিঠাই সাজিয়ে রাখলেই হয়, সব রাগ গলে জল!

এই এক দাওয়াইতেই যখন চলে আসছে যুগের পর যুগ তখন আর তাঁদের নতুন কিছুর খোঁজার কি দরকার আছে আদৌ?

ছুটি

দুর্গা পূজা এ মাসের শেষে পড়ে যাওয়াতে সে সময় পত্রিকা বন্টন ব্যবস্থা চালু থাকবে না। ফলে ‘এখন ডুয়ার্স’ ১ অক্টোবর সংখ্যা প্রকাশ সম্ভব হবে না। তারপর ১৬-৩১ অক্টোবর সংখ্যা নির্ধারিত সময়েই বের হবে। ছুটির আনন্দ সবাই উপভোগ করুন সুস্থ শরীরে ও মনে এই কামনা করি।

প্রকাশক

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস
প্রচ্ছদ ছবি: জ্যোতিষ্মান রাহা
জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন
ইমেল ekhonduars@yahoo.com

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

Building Planner Consultancy
A Group of Engineers
All type of building planning, estimating and designing done here. Site visiting service is also available.
+91 8016056415 / 9749001539
Our Branch: Banarhat, Dhupguri
email: chaudhurybubun@gmail.com
alierfan4@gmail.com
www.technotrustconstruction.com

গোরুমারার পর্যটন

ডুয়ার্সের পরিচিতি যাকে ঘিরে সেই গোরুমারার পর্যটন এখন কী অবস্থায়?

প্রকৃতি নিজেকে সাজায় আর সুসজ্জিত প্রকৃতির কোলে সুন্দর হয় মানুষ। অফুরন্ত সৌন্দর্যের অনুরূপ রূপশ্রীতে পরিপূর্ণ ডুয়ার্সের গোরুমারা জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে উদ্যানের বুক চিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অখ্যাত একটি ছোট্ট জনপদ লাটাগুড়ি আজ বিখ্যাত হয়ে পৌঁছে গিয়েছে বিশ্বের দরবারে। ১৯৯৬ সালে লাটাগুড়িতে ইকো টুরিজম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর গত একুশ বছরে শুধুমাত্র লাটাগুড়ির বুকেই গড়ে উঠেছে এবং চালু হয়েছে গোটা পঞ্চাশেক রিসর্ট। এ ছাড়া নির্মিত হয়েছে অত্যাধুনিক হোটেল, দোকানপাট, বাজার ইত্যাদি। গোরুমারা জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে লাটাগুড়ির আর্থ-সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। উদ্যানকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র লাটাগুড়ি নয়— উদ্যান সংলগ্ন টিলাবাড়ি, বাতাবাড়ি, ধূপঝোরা, মূর্তি, পানবাড়ি, রামশাই প্রভৃতি এলাকায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আরও প্রায় গোটা পঞ্চাশেক সুদৃশ্য টুরিস্ট লজ নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় আরও বেশ কিছু টুরিস্ট লজ 'হোমস্টে' ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের সাম্প্রতিক সংযোজন— সরকারি উদ্যোগে নির্মিত টিলাবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্স, ধূপঝোরা-বাতাবাড়ি মোড়ে সরকারি টুরিস্ট লজ এবং লাটাগুড়িতে ৩১ নং জাতীয় সড়কের পাশে নির্মিত 'পথ-সাথী'। এ ছাড়া গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের অনতিদূরে পশ্চিম ডামডিম টুরিস্ট লজ। এসবই অত্যন্ত উন্নতমানের ও সুদৃশ্য। বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত এমন বেশ কয়েকটি টুরিস্ট লজ রয়েছে, যেগুলো শুধু সুদৃশ্যই নয়, অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ও উন্নতমানের। এই টুরিস্ট লজগুলোর মধ্যে কয়েকটি টুরিস্ট লজকে থ্রি-স্টার ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

> গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ম্যাজিক চুম্বকের মতো পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। পর্যটকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। উদ্যানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানকার প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র। এই উদ্যানকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে এখানকার প্রাগৈতিহাসিক একশৃঙ্গ গন্ডার।

একসময়ে গোরুমারা জাতীয় উদ্যানসহ গোটা ডুয়ার্স এলাকা ছিল ভুটান সরকারের অধীনে। ১৮৬৪ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার ভুটানের কাছ থেকে এই উদ্যানসহ গোটা ডুয়ার্স দখল করে নেয়। পরে ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হলে উদ্যানসহ গোটা ডুয়ার্স এলাকাকে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ আমলে গোরুমারাকে রিজার্ভ ফরেস্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৯ সালে বনের গভীরতা ও বন্য প্রাণীর নিরিখে গোরুমারার ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে গোরুমারা অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে জীববৈচিত্রের নিরিখে গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৯৬ সাল থেকে এই উদ্যানকে ঘিরে শুরু হয় প্রকৃতি পর্যটন।

কীসের টানে বা কোন আকর্ষণে পর্যটকরা গোরুমারায় আসেন?

হিমালয়ের পাদদেশে নদীনালা, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত আর সবুজ চা-বাগানের গালিচা-পাতা দেশ হল ডুয়ার্স। কী আশ্চর্য এক মায়া জড়িয়ে আছে ডুয়ার্সের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের স্তরে স্তরে, পরতে পরতে। এই সৌন্দর্যের মায়াকাজল পরানো পশ্চিম ডুয়ার্সে মূর্তি ও জলঢাকা নদী পরিবেষ্টিত এক অপূর্ব ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপম রূপশ্রীতে বর্তমানে ৮০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থান করছে গোরুমারা জাতীয় উদ্যান। উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ম্যাজিক চুম্বকের মতো পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। পর্যটকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। উদ্যানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানকার প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র। এই উদ্যানকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে এখানকার প্রাগৈতিহাসিক একশৃঙ্গ গন্ডার। এই উদ্যানেই রয়েছে এশিয়ান

ছবি: মৌসম রায়

হস্তিকুল আর ভারতীয় গাউর, যাকে স্থানীয়ভাবে বাইসন বলা হয়। এই উদ্যানে একদিকে যেমন রয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণী, তেমনই রয়েছে নানা প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ, খেচর, উভচর ও জলচর প্রাণী। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল জুড়ে হস্তিকুলের পদচারণা ও বৃংহণ কখনও কখনও মুখরিত করে তোলে গোরুমারার নিস্তব্ধতাকে। হাতির দল বনভূমি ও তৃণভূমি ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসে লোকালয়ে। গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে এ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। বাইসনের দলবদ্ধ বিচরণ হামেশাই চোখে পড়ে। জীববৈচিত্রের নিরিখে এই উদ্যানে দেখা যায় চিতল হরিণ, শম্বর, বন্য বরাহ, শশক, বেজি, নেউল, ভাম, গন্ধগোকুল, বানর, বনবিড়াল, বুনো কুকুর প্রভৃতি। লেপার্ড হল এই উদ্যানের আদিম হিংস্র জীব। কখনও কখনও শাবক প্রসবের সুবিধার্থে বা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসে উদ্যান সংলগ্ন চা-বাগান ও গ্রামাঞ্চলে। উদ্যানকে ঘিরে রয়েছে মূর্তি ও জলঢাকা নদী। এই দুইটি নদী ছাড়াও উদ্যানের ভিতরে রয়েছে বিল, ঝিল, জলাশয় ও ছোটবড় নালা-ঝোরা প্রভৃতি। এই নদীনালা, ঝোরা, বিল-ঝিল, জলাশয়কে কেন্দ্র করে উদ্যানের সর্বত্র গড়ে উঠেছে শত শত প্রজাতির দেশি-বিদেশি পক্ষিকুলের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে নানা জলচর পাখি, রাতচরা পেচক প্রভৃতি। ময়ূরের পেখম-তোলা নৃত্যে কখনও কখনও আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠেন

ছবি: বিরুপাক্ষ মিত্র

গোরুমারায় আগত পর্যটকরা। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য বিহঙ্গকুলের মধ্যে রয়েছে ইগল, বাজপাখি, সারস, ধনেশ, পাহাড়ি ময়না, টিয়া, হরিয়াল, বুনো কবুতর, রাজশকুন প্রভৃতি। এসবই পর্যটকদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তোলে। নানা প্রজাতির ছোটবড় অসংখ্য প্রজাতির গাছগাছালি, সুদীর্ঘ তৃণ, এবড়োখেবড়ো নলখাগড়াবন, কোমল জলাভূমি, অগভীর নির্মল জলাশয়, আঁকাবাঁকা পথে বয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র জলতরঙ্গ, নানা প্রজাতির বুনো ফুলফলাদি, অর্কিড, লতাগুল্ম, পাতাবাহার, ঝোপঝাড়, বেতবন, কাশবন প্রভৃতি গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের সৌন্দর্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উদ্যানের জীববৈচিত্রকে আরও বেশি বৈচিত্রময় ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে নানা প্রজাতির সাপ— যার মধ্যে আছে ময়াল, পাইথন, কিং কোবরা প্রভৃতি। তা ছাড়া আছে নানা প্রজাতির কীটপতঙ্গ, রংবেরঙের প্রজাপতি, মথ, পোকামাকড়, পিঁপড়ে, কেঁচো, জোঁক, মাছ, মাছি, ব্যাং, কাঁকড়া প্রভৃতি। উদ্যান সংলগ্ন বনবস্তি এলাকার প্রাচীন জনজাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি, নৃত্যগীত, জীবনযাত্রা ইত্যাদি জানার বিষয়ে পর্যটকরা আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই বনবস্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিছাভাঙা, সুরসুরি, বামনি, কালীপুর, চটুয়া, কালামাটি, বুধরাম, খুনিয়া প্রভৃতি। গোরুমারার অন্যতম আকর্ষণ হল শতাব্দীপ্রাচীন গোরুমারা ফরেস্ট বাংলো, যা তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। পূর্বে এই ফরেস্ট বাংলোটি সাহেবদের 'রেস্ট হাউস' নামে পরিচিত ছিল।

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে বা লাটাগুড়িতে আসার যোগাযোগ ব্যবস্থা

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের কাছাকাছি বড় রেলওয়ে স্টেশন হল নিউ মাল। কলকাতা থেকে 'কাঞ্চনকন্যা' এক্সপ্রেস নামে একটিমাত্র ট্রেন নিউ মাল হয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত যাতায়াত করে। উদ্যানের উদ্দেশে আগত পর্যটকরা সাধারণত এই ট্রেনেই যাতায়াত করে থাকেন। নিউ মাল থেকে প্রাইভেট গাড়িতে বা বাসে গোরুমারা উদ্যানে আসা যায়। দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। লাটাগুড়ির দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার। এ ছাড়া যাঁরা অন্য ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি আসেন, তাঁরা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে উদ্যান সংলগ্ন টুরিস্ট লজগুলোতে এসে পৌঁছান। এর ফলে পর্যটকদের যে পরিমাণ গাড়ি ভাড়া গুনতে হয় তা সাধারণ পর্যটকদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই পর্যটকদের গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে সহজে ও সরাসরি যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিউ কোচবিহার-চ্যাংরাবান্ধা-দোমোহনি-লাটাগুড়ি-নিউ মাল হয়ে সরাসরি কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার দাবি উঠেছে। এক্ষুনি কোনও কারণে এক্সপ্রেস ট্রেন দেওয়া সম্ভব না হলে কমপক্ষে নিউ কোচবিহার থেকে বিকেলের দিকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ওই রেলপথে চালানো হোক। এই সমস্যার কারণে ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে গোরুমারার পর্যটকদের স্বার্থে এনজেপি থেকে লাটাগুড়ি পর্যন্ত একটি সরকারি বাস চালু করা হয়। কিন্তু একটিমাত্র বাসে খুব কম সংখ্যক পর্যটক যাতায়াত করতে পারেন। ট্রেন চালু করা হলে যেমন অধিক সংখ্যক পর্যটক যাতায়াত করতে পারবেন, তেমনই এই জঙ্গল ও পাহাড়ি পথে রেল ভ্রমণ পর্যটকদের কাছে রোমাঞ্চকর ও আনন্দমুখর হয়ে উঠবে।

সড়ক যোগাযোগ

সড়কপথে শিলিগুড়ি থেকে তিনদিক দিয়ে লাটাগুড়ি বা গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে আসা যায়। একটি রাস্তা শিলিগুড়ি থেকে সেবক, ওদলাবাড়ি, মালবাজার হয়ে গোরুমারা জাতীয় উদ্যান পর্যন্ত বা লাটাগুড়ি পর্যন্ত আসে। এই রাস্তায় দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। দ্বিতীয় রাস্তাটি শিলিগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে লাটাগুড়ি পর্যন্ত আসে। এই রাস্তায় দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। তৃতীয় আরেকটি শর্টকাট রাস্তা আছে, যে রাস্তায় প্রাইভেট গাড়িতে শিলিগুড়ি-আমবাড়ি-গজলডোবা-ক্রান্তিহাট হয়ে লাটাগুড়িতে আসা যায়। দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার।

ছবি: মৌসম রায়

ছবি: বিরুপাক্ষ মিত্র

চিকিৎসা ব্যবস্থা

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পর্যটন আবাস বা টুরিস্ট লজগুলোতে যেসব টুরিস্ট রাত্রিবাস করেন, তাঁদের মধ্যে মূর্তি, ধূপঝোরা, বাতাবাড়ি এলাকার পর্যটকদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য মঙ্গলবাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র বর্তমান এবং এসব এলাকায় পর্যটকদের রাত্রিকালীন বা আপৎকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের সবচেয়ে কাছে যে লাটাগুড়ি, সেখানকার রাত্রিযাপনকারী পর্যটকদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবার তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক দরবার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লাটাগুড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে মৌলালিতে অবস্থিত মৌলালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লাটাগুড়ি-রামশাই এলাকায় আগত পর্যটকদের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষায় থাকা।

বিবিধ সমস্যা

১) গাড়ি ভাড়া, রিসর্ট ভাড়া, খাওয়াদাওয়ার খরচ ও বনাঞ্চলে প্রবেশের টিকিট কাটা নিয়ে একটি দালালচক্র সক্রিয় আছে। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে এই দালালচক্র কিছুটা প্রশমিত হলেও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়নি। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যটকরা নানারকম বিভ্রান্তি ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে। লাটাগুড়ি ও মূর্তি এলাকায় স্থাপিত টুরিস্ট পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথগুলোকে আরও বেশি সক্রিয় করে তুলতে হবে এবং

ছবি: মৌসম রায়

GAJAGAMINI FOREST RESORT

Don't Settle for the Second Best

Salient Features:
Special Packages for Companies
Group Booking
Indian & Chinese Restaurant
Children Park & Car Parking Facility
Two minutes walking distance from Garumara NP
Car Rental for Jungle Safari
Doctor on Call
100% Backup
Intercom Facility

Room Rent:
Double (Eco) ₹1500, Double (AC) ₹2000, Family Delux ₹2500 (+12% Tax)

Vill - Bichabhanga, PO - Lataguri, Near Garumara Forest Range Office-1
Contact:
+91 9830712000 / 03561-266524
Regd. Office: 10/8 Koyla Vihar, Vasundhara, VIP Road, Kolkata-52
Phone: 9830894981
email: gajagaminilataguri@gmail.com
www.gajagamini.com

ছবি: মৌসম রায়

বহিরাগত পর্যটকদের সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে, তা না হলে গোরুমারা জাতীয় উদ্যান সম্পর্কে পর্যটকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

২) গাড়ি ভাড়া, রিসর্ট ভাড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্যাটেগরি অনুযায়ী পর্যটক আবাসগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় থাকতে হবে। গোরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন টুরিস্ট লজগুলোর মধ্যে এ সমন্বয় না থাকায় পর্যটকদের মধ্যে একেক টুরিস্ট লজে একেকরকম ভাড়া নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

৩) গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের ভিতরে প্রবেশ করার পর বন্য প্রাণীদের কোনওরকম বিরক্ত না করা, ফোটো তোলার জন্য বন্য প্রাণীদের কাছাকাছি এগিয়ে না যাওয়া, প্লাস্টিকের বোতল, খাদ্যদ্রব্যাদির প্যাকেট ইত্যাদি বনাঞ্চলে ফেলে না দেওয়া— এই বিষয়গুলো নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে আরও বেশি সচেতনতা তৈরি করার জন্য বন বিভাগকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪) গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের লাটাগুড়ি ও মূর্তিতে দু'টি ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। পর্যটকদের সুবিধার্থে মূর্তি নদীতে একটি স্নানের ঘাট নির্মাণের দাবি

ছবি: তাপস দাস

উঠেছে।

৫) আজকাল গোরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন টুরিস্ট লজগুলোতে বিবাহ-অন্নপ্রাশনসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বন সংলগ্ন রিসর্টগুলোতে আয়োজিত এ ধরনের অনুষ্ঠানে তারস্বরে মাইক ও ডিজে বাজানো এবং অকারণ চিৎকার-চেঁচামেচি করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া উচিত।

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন ওয়াচটাওয়ারে প্রবেশ ও জঙ্গল সাফারির সময়সূচি

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে বন ও বন্য প্রাণী দর্শনের ক্ষেত্রে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় কয়েকটি ওয়াচটাওয়ার ও জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে। এই ওয়াচটাওয়ারগুলোতে প্রবেশের মূল্য ও সময় নিম্নরূপ—
পর্যটকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ হল গোরুমারা ওয়াচটাওয়ার থেকে বন ও বন্য প্রাণী দর্শন। গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে এখন পর্যন্ত ৫টি ওয়াচটাওয়ার চালু আছে। এই ওয়াচটাওয়ারগুলোতে প্রবেশমূল্য ও জিপসি ভাড়া নিচে দেওয়া হল।
১) প্রতিটি ওয়াচটাওয়ারের ৪টি শিফ্‌টে পর্যটকদের জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি শিফ্‌টের জনপ্রতি ভাড়া নিম্নরূপ—
প্রতিটি ওয়াচটাওয়ারে যাওয়ার জন্য জিপসি গাড়ি ভাড়া করা একান্তই বাধ্যতামূলক। কোনও প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ওয়াচটাওয়ার	১ম শিফ্‌ট জনপ্রতি	২য় শিফ্‌ট জনপ্রতি	৩য় শিফ্‌ট জনপ্রতি	৪র্থ শিফ্‌ট জনপ্রতি
যাত্রাপ্রসাদ	১২০ টাকা	১২০ টাকা	১২০ টাকা	১৬০ টাকা
মেদলা	১২০ টাকা	১২০ টাকা	১২০ টাকা	১২০ টাকা
চন্দ্রচূড়	৭০ টাকা	৭০ টাকা	৭০ টাকা	১২০ টাকা
চাপড়ামারি	৭০ টাকা	৭০ টাকা	৭০ টাকা	১২০ টাকা
চুকচুকি	৭০ টাকা	৭০ টাকা	৭০ টাকা	১২০ টাকা

RESORT GREEN WAVE

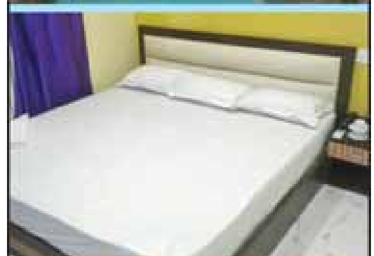

ROOM TARIFF:
1st Floor, Double Bed Room (AC) ₹**2000.00**
1st Floor, Dilux Double Bed Room (AC) ₹**2400.00**
Tower Double Bed Room (AC) ₹**1800.00**
Cottege Double Bed Room ₹**1500.00**
Gr. Floor Double Bed Room ₹**1200.00**
Double Bed Room ₹**990.00**

Samir Paul
+91 7679324601
Keshab Ch. Roy
+91 9932897168
Lataguri,
Garumara National Park
Jalpaiguri - 735219
email:
samirpaul.aaheli@gmail.com

এ ক্ষেত্রে জিপসি ভাড়ার মূল্য নিচে দেওয়া হল। লাটাগুড়িতে অবস্থিত নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকেই এই জিপসি গাড়ি পাওয়া যায়। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের টিকিটও এখান থেকেই পাওয়া যায়। প্রতিটি জিপসিতে সর্বাধিক ছয় জন পর্যটক যেতে পারেন। এক্ষেত্রে পর্যটকরা শেয়ার করেও যেতে পারেন।

জানা গিয়েছে পুজোর মুখে হঠাৎ করে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ মূল্য বাড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়ে পর্যটক ও পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সকলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে এইভাবে প্রবেশ মূল্য বাড়ানো হলে সাধারণ পর্যটকদের বাজেট টান পড়বে এবং পর্যটকরা গরুমারা বিমুখ হয়ে পড়বেন। ফলে পরবর্তীতে পর্যটন শিল্পে সঙ্কট দেখা দেবে।

বিভিন্ন ওয়াচটাওয়ারে প্রবেশমূল্য ও জিপসি ভাড়া ছাড়াও দিতে হয় গাইড ফি ১৮০ টাকা (জিপসিপ্রতি), এন্ট্রি ফি ১০০ টাকা এবং ভিডিয়ো ক্যামেরা (যদি নেওয়া হয়) বাবদ ২০০ টাকা।

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন ওয়াচটাওয়ারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সময়ের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে ঠিক সময়মতো টিকিট কাউন্টারে না পৌঁছালে অনেক সময় টিকিট না-ও মিলতে পারে। নিচে সময়সূচি দেওয়া হল–

ওয়াচটাওয়ারের নাম	জিপসি ভাড়া
যাত্রাপ্রসাদ	৯৩০ টাকা
মেদলা	৯৩০ টাকা
চন্দ্রচূড়	৯৩০ টাকা
চাপড়ামারি	১০৮০ টাকা, চার শিফ্টের জন্য ১২৯০ টাকা
চুকচুকি	৬৯০ টাকা

মেদলায় গোরুর গাড়িতে জঙ্গলে এক কিলোমিটার ভ্রমণের সুযোগ আছে পর্যটকদের জন্য।

প্রতিটি জিপসিতে সর্বাধিক ছয় জন পর্যটক যেতে পারেন। এক্ষেত্রে পর্যটকরা শেয়ার করেও যেতে পারেন।

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে—

১) ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর জীবজন্তুর প্রজননগত কারণে গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে বিভিন্ন ওয়াচটাওয়ারে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। জঙ্গল সাফারিও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। এই সময়ে একমাত্র পর্যটকরা মেদলা ওয়াচটাওয়ারে প্রবেশ করতে পারেন। এ জন্য মেদলা ওয়াচটাওয়ারের গেটে টিকিট কেটে প্রবেশ করার ব্যবস্থা আছে। লাটাগুড়ি এনআইসি-র টিকিট কাউন্টার এ সময় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

২) গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের ওয়াচটাওয়ারে প্রবেশের জন্য পর্যটককে স্বয়ং টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ফোটো আইডেন্টিটি কার্ড অবশ্যই সঙ্গে থাকতে হবে। প্রতি বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ওয়াচটাওয়ারে সাফারি বন্ধ থাকে।

জঙ্গল সাফারি ও হাতির পিঠে ভ্রমণ

৩) গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন ওয়াচটাওয়ার ছাড়াও গোরুমারায়

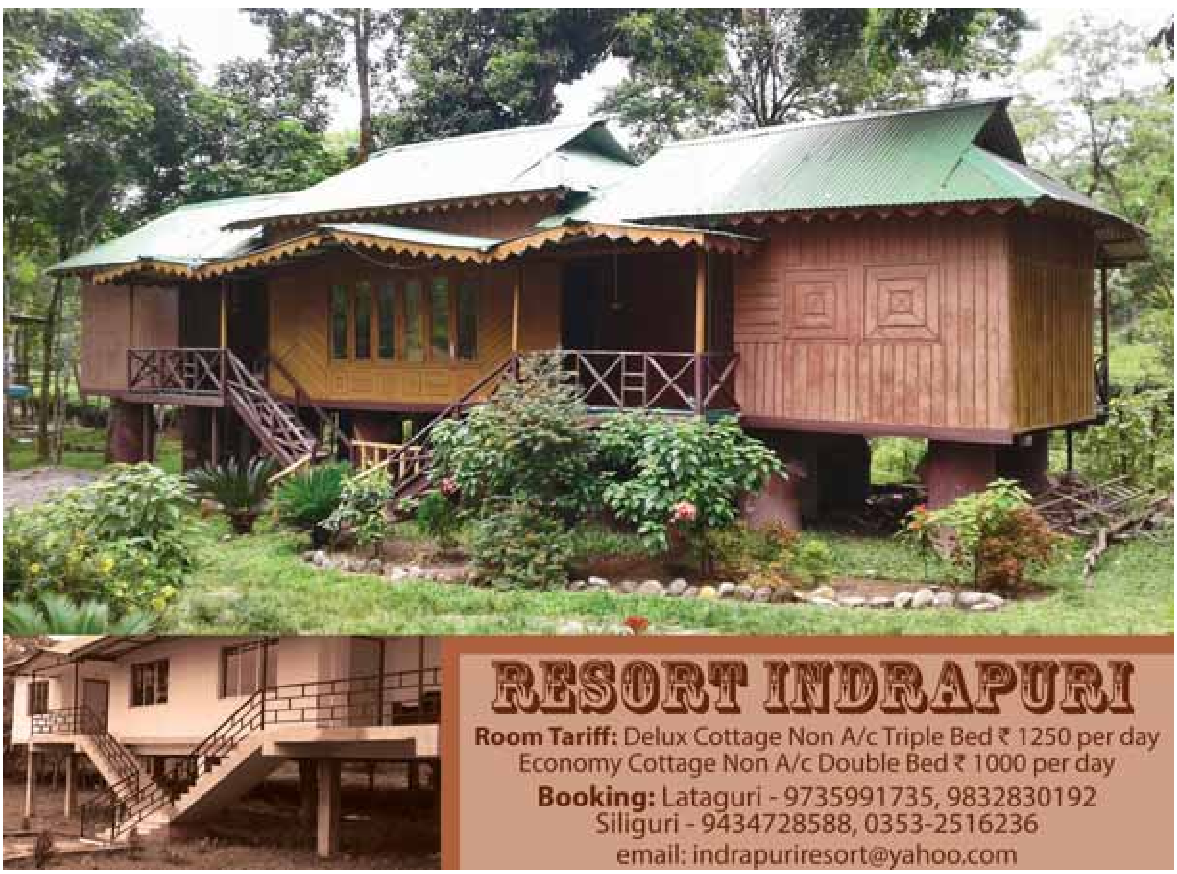

ছবি: সৌত্রিক দত্ত

সময়সূচি— মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর

	টিকিটপ্রাপ্তির সময়	প্রবেশ ও অবস্থান
১ম শিফ্‌ট	সকাল ৫.৩০টা	৬.০০-৭.৩০টা সকাল
২য় শিফ্‌ট	সকাল ৬.৩০টা	৮.৩০-১০টা সকাল
৩য় শিফ্‌ট	দুপুর ১.০০টা	২.০০-৩.০০-৫.০০টা অপরাহ্ণ
৪র্থ শিফ্‌ট	অপরাহ্ণ ২.০০টা	৪.৩০-৬.০০টা সন্ধ্যা

সময়সূচি— অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি

	টিকিটপ্রাপ্তির সময়	প্রবেশ ও অবস্থান
১ম শিফ্‌ট	সকাল ৬.০০টা	৬.৩০-৮.০০টা সকাল
২য় শিফ্‌ট	সকাল ৭.০০টা	৯.০০-১০.৩০টা সকাল
৩য় শিফ্‌ট	দুপুর ১২.০০টা	১.০০-২.৩০টা অপারাহ্ণ
৪র্থ শিফ্‌ট	দুপুর ১.০০টা	৩.৩০- ৫.০০টা সন্ধ্যা

সকাল-বিকেল দু'টি শিফ্‌টে জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। এই জঙ্গল সাফারির টিকিট পাওয়া যায় লাটাগুড়ি বাজার সংলগ্ন রেঞ্জ অফিস থেকে। সকাল ৬টায় ও বিকেল ৩টেয়

Resort
SUN
N
SERVICES

ACCOMODATION
Modern equiped well furnished double bedded Non AC room
@ ₹1500.00
Four beded (suitable for 5 to 6 persons) room
@ ₹1900.00
Our check out time is 12 noon

Contact for Booking
9830700562
8436050759
Lataguri,
Jalpaiguri
email:
s.partho562@gmail.com
www.resortsunnservices.co.in

ছবি: বিরূপাক্ষ মিত্র

ছবি: রাহুল সিং

ছবি: রাহুল সিং

এই জঙ্গল সাফারিতে পর্যটকদের গোরুমারা জঙ্গলের ভিতর ৪০ কিলোমিটার পথ ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই জঙ্গল সাফারি অত্যন্ত আনন্দদায়ক। পর্যটকদের কাছে জঙ্গল সাফারি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। জিপসি ভাড়া ১০৮০ টাকা, প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ১০০ টাকা, পার্কিং ফি ৫০ টাকা এবং গাইড চার্জ জিপসিপ্রতি ১৮০ টাকা।
জঙ্গল সাফারিতে পর্যটকদের বনের ভিতরে

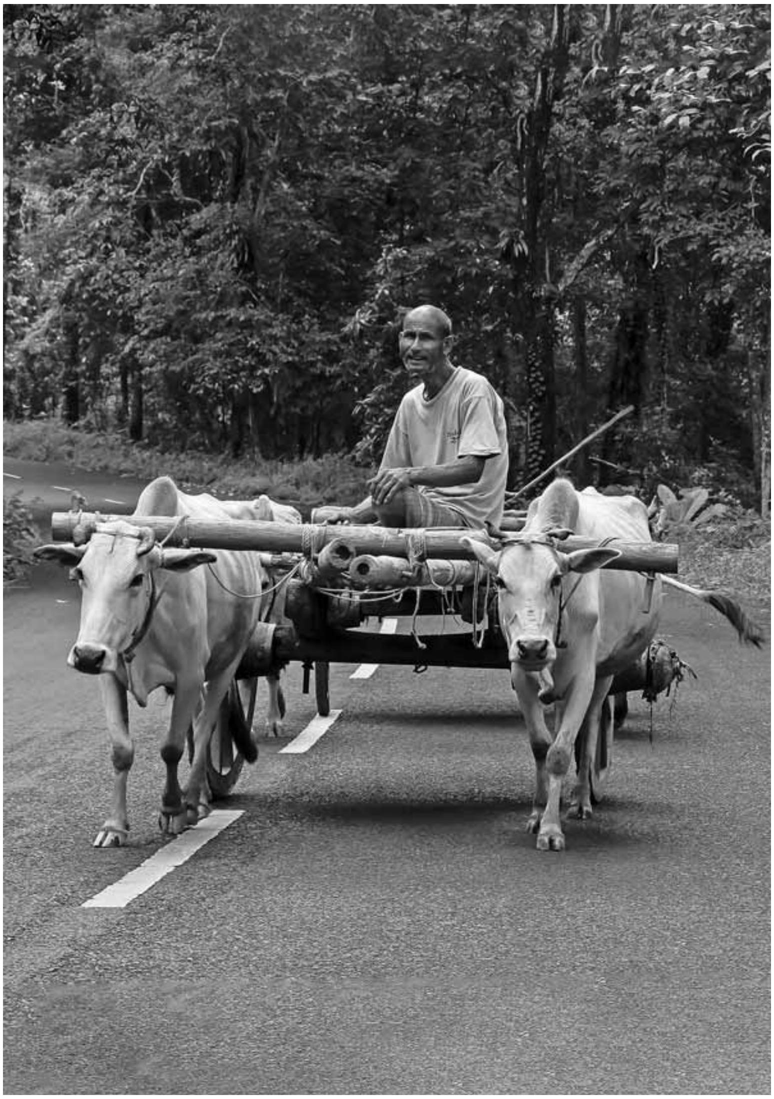

ছবি: তাপস দাস

মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ নেওড়া নদীর তীরে অবস্থিত কলাখাওয়া ওয়াচটাওয়ার ঘুরিয়ে আনা হয়। জানা দরকার যে, কলাখাওয়া ওয়াচটাওয়ার গোরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়ির জঙ্গলে অবস্থিত হলেও উদ্যানের মূল সীমানাভুক্ত নয়।

৪) হাতির পিঠে ভ্রমণের সুবিধা— গোরুমারা জাতীয় উদ্যানে বন বিভাগ পরিচালিত কালীপুর ইকো টুরিস্ট লজ, রামশাই রাইনো ক্যাম্প এবং ধূপঝোরার গাছবাড়ি প্রভৃতি টুরিস্ট লজে যে পর্যটকরা রাত্রিবাস করবেন— একমাত্র তাঁদের জন্যই বর্তমানে হাতির পিঠে জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য টুরিস্ট লজে যে পর্যটকরা রাত্রিবাস করেন, তাঁদেরও হাতির পিঠে জঙ্গলে সাফারি করার সুযোগ প্রদানের দাবি দীর্ঘদিন ধরে করা হচ্ছে। এ ছাড়া সংলগ্ন কাঠামবাড়ি বনাঞ্চলে জঙ্গল সাফারির দাবি উঠেছে।

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের আশপাশে

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন পর্যটক আবাসে যাঁরা রাত্রিবাস করেন, তাঁরা ইচ্ছে করলে এখান থেকে সহজেই জলদাপাড়া, রাজাভাতখাওয়া, বক্সা, জয়ন্তি, মাদারিহাট, জয়গাঁ, ভুটানের ফুন্টশিলিং, বিন্দু, ঝালং, সামসিং, সুনতালেখোলা, সাকাম, গজলডোবা, কাঠামবাড়ি, লাভা, লোলেগাঁও, রিষভ প্রভৃতি স্থানে ঘুরে আসতে পারেন। এ ক্ষেত্রে টুরিস্ট লজ কর্তৃপক্ষই পর্যটকদের সুবিধামতো ছোট গাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেন।

স্থানীয়ভাবে যেসব সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, বিদ্যুৎ পরিষেবা, টেলি যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং ও এটিএম পরিষেবা উন্নত করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি গোরুমারা জাতীয় উদ্যানকে পর্যটকদের কাছে সব দিক থেকে আকর্ষণীয় ও উন্নত পর্যটনব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। এগুলো হল—

১) জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে মডেল গ্রাম তৈরি করা ও তাদের শিল্পকর্ম লোকসংস্কৃতি প্রদর্শন।

২) পক্ষী পর্যবেক্ষণকেন্দ্রসহ নৌবিহারের ব্যবস্থা করা।

৩) টি টুরিজম প্রকল্প চালু করা এবং আদিবাসী যুবক-যুবতীদের যুক্ত করা।

৪) পরিবেশবান্ধব পার্ক, ভেষজ উদ্যান ও ভেষজ লাইব্রেরি তৈরি করা।

৫) মালবাজারে একটি টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার গড়ে তোলা।

৬) গোরুমারা জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে প্যারাগ্লাইডিং, র‍্যাফটিং, রিভার ক্রসিং, কায়াকিং, ট্রেকিং, সাইক্লিং, ক্যানোপি ওয়াক, লাটাগুড়ি থেকে রামশাই পর্যন্ত পরিত্যক্ত রেললাইনে টয় ট্রেন চালু করা, রোপওয়ে নির্মাণ, বন ও বন্য প্রাণী সংক্রান্ত মিউজিয়াম নির্মাণ, হস্তশিল্পের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বিপণনকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি নানারকম সম্ভাবনা রয়েছে— এগুলো সরকারিভাবে বাস্তবায়িত করার দাবি উঠেছে। এ ছাড়া উদ্যানে কচ্ছপ সংরক্ষণ ও প্রজননকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। হোমস্টে নির্মাণে উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে জনজাতির লোকেদের পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা, পাশাপাশি টি টুরিজমে জোর দিয়ে বন্ধ চা-বাগানের আদিবাসী যুবতীদের পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করে নারী পাচার রোধ করার দাবি উঠেছে।

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে ছোট থেকে মাঝারি বা মাঝারি থেকে বড়সড়ো মাপের যে অসংখ্য টুরিস্ট লজ নির্মিত হয়েছে, সেগুলোতে সবরকম পর্যটকদের সাধ্যমতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বড় মাপের টুরিস্ট লজগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইটও আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নির্মিত টুরিস্ট লজগুলোতে অনলাইন টিকিট পাওয়া যায়। তা ছাড়া বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমেও উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়িসহ অন্যান্য টুরিস্ট লজ বুকিং করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে সচেষ্ট ও আন্তরিক। গোরুমারা জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে পর্যটনশিল্পের বিকাশের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে তা রূপায়ণের কাজে সরকার বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করবে— এটাই কাম্য।

পরাণ গোপ

ছবি সৌজন্যে জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশন

মন্ডপে আসছেন মা দুর্গা

কোথায় হারিয়ে গেল সেই আনন্দের দিনগুলি? পুজোর মুখেও চা-বাগানগুলি ঘিরে কেবল হতাশা!

দেশের মধ্যে ন্যুনতম মজুরির চা-শ্রমিকরা শত দারিদ্র অভাবের মধ্যেও দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন মেতে উঠত সবেতন ছুটি ভোগ করার আনন্দ নিয়ে। দুঃখের বিষয় আজ সে আনন্দও হারিয়ে গিয়েছে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি থেকে। কারণ বাগানের তরুণ প্রজন্ম আজ আর ফূর্তি করবার জন্য ঘরে বসে নেই, তারা গিয়েছে ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে। অথচ শ্রমিকদের একশ্রেণির হাতে আসছে কাঁচা পয়সা, অবশ্যই যা ন্যায়ের পথে নয়। শ্রমিক মহলেই অভিযোগ উঠছে তাদের বিরুদ্ধে— বন্ধ হয়ে থাকা বাগানগুলিতে চলছে অবাধ লুঠ। কোথাও কোথাও চলছে বাগান নিশ্চিহ্ন করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বসতি স্থাপনের মাফিয়া রাজ। তাদের কথায়, এসব কোনও কিছুই রাজনৈতিক মদত ছাড়া সম্ভব নয়! শেষ পর্বে এসে প্রতিবেদক **ভীষ্মলোচন শর্মা** প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ডুয়ার্সের চা-বাগান নিয়ে তাঁর চারণিক কলম চলতেই থাকবে।

‘এখন ডুয়ার্স’-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ভীষ্মলোচন শর্মার ডুয়ার্সের চা-বাগিচা সফরের এটাই শেষ পর্ব। বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন করে সম্পাদকমশাই এবং ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান যখন তাঁদের পরিকল্পনার কথা বলে আমার সহযোগিতা চেয়েছিলেন, তখন একদিকে যেমন কাজটা দুঃসাহসিক এবং কঠিন বলে মনে হয়েছিল, অন্য দিকে কঠিন কাজের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ‘এখন ডুয়ার্স’কে আরও সমৃদ্ধ করাটাও গুরুদায়িত্ব বলে মনে হয়েছিল। গুরুদায়িত্ব বলছি এই কারণেই যে, উত্তরবঙ্গের এতগুলো চা-বাগিচা ঘুরে, সমীক্ষা করে, সমস্যাদীর্ণ, সংকটাকীর্ণ বাগিচাগুলোর হালহকিকত তুলে ধরার সময় পাব কী করে? কারণ পেশাগতভাবে আমি তো শিক্ষক, নেশায় আমার লেখালেখি। মসিকে তীক্ষ্ণ অসি করে ডুয়ার্সের পথেপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে গেলে যে সময়, পরিশ্রম, সোর্স, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে

যোগাযোগ, বাগিচাগুলোর পরিচালনগত নিয়মকানুন জানা প্রয়োজন— তার কোনওটাই আমার নেই। তাহলে কেমন করে আমি সম্পাদকমশাইয়ের প্রত্যাশা পূরণ করব? একটু দ্বিধা নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম সম্মতি জানিয়ে সাহসে ভর করেই। মজুরি নিয়ে তখন বাগিচায় বাগিচায় মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের তীব্র লড়াই। অন্য দিকে বোনাসের ন্যায্য দাবি। সেপ্টেম্বর মাস। সামনেই পুজো। ২০১৬ সাল। ঠিক এবারের মতোই পুজোর প্রাক্কালে সেপ্টেম্বরের এক সমস্যাজর্জরিত মুহূর্তকালে বাগিচা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদে প্রথম লেখাতেই লিখলাম 'দ্রব্যমূল্যের নিরিখেই শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হোক।' কারণ স্বাধীন ভারতে কেউ সারাদিন কাজ করার পর ৯৬ টাকা মজুরি পাবে এবং ২ কেজি দরে ৩৫ কেজি চাল পরিবারপিছু খাদ্যসুরক্ষার স্কিমে, এবং সেই টাকাটাও বাগিচা কর্তৃপক্ষর শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে ধরে নিয়ে বলবেন, 'দেখো, ওরা তো ১২৬ টাকা মজুরি পাচ্ছে।' অথবা সরকার বলবে, 'শ্রমিকদের ২ টাকা কেজি চাল আমরাই তো দিচ্ছি।'— ব্যাপারগুলো ভীষণই মর্মান্তিক মনে হয়েছিল। যত শিল্প রয়েছে, সেইসব শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরি বাগিচা শ্রমিকদেরই এবং এখানে প্রাইস ইনডেক্সের কোনও গল্পকথা নেই। আর ২ টাকা কেজির চাল তো কেন্দ্রীয় খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প। রাজ্য সরকার তো বিতরণ করে।

ঘুরতে লাগলাম বাগিচা থেকে বাগিচায়। প্রথম প্রথম ক্যামেরা নিয়ে যেতাম না। কারণ জনৈক শুভানুধ্যায়ী মানা করে দিয়েছিলেন, 'নির্জন চা-বাগিচায় যাবে ভুখা শ্রমিকের ইন্টারভিউ নিতে। ক্যামেরাটা গালে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিলেই তো ওর অন্তত এক কুইন্টাল চালের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।' ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খুব। নির্দ্বিধায় বলছি। কিন্তু যত ঘুরেছি, একটা কথা বুঝেছি— সমস্যা আছে, ভুখা পেট আছে, বঞ্চনা আছে, বৈষম্য আছে, মালিকদের শোষণ আছে, ডুয়ার্সের বাগিচায় অসহায়ত্ব রয়েছে, ক্ষোভ রয়েছে, হতাশা রয়েছে, দীর্ঘশ্বাস রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে অদ্ভুত এক সরলতা, ভাগ্যের প্রতি অসহায় আত্মসমর্পণ আর আপাত শান্তি। শ্রমিকদের চোখে-মুখে ক্ষোভের অভিব্যক্তি দেখেছি, অস্থিচর্মসার চেহারা দেখেছি, ক্রেসে শিশুদের ডাগর চোখের নির্বাক চাহনি দেখেছি, বান্দাপানি-ঢেকলাপাড়ার ভয়ংকর সামাজিক জীবন দেখেছি, বান্দাপানি চা-বাগানে 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'-এর সহায়তা প্রকল্পের দানসামগ্রী প্রায় লুটপাট হবার মতো দশাও প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে, আবার পাশাপাশি এই অসহায়তার মধ্যেও বন্ধ ধরণিপুর বাগানের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ১০০ শতাংশ পাশের খবর প্রত্যক্ষ করেছি। কাজেই হতাশা আছে, আশাও আছে। দুঃখের পাশাপাশি সুখও আছে। তা নইলে রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগিচার জয়ন্তি, চ্যাংমারির সনিয়াদের মুখে 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড' এভাবে হাসি ফোটাতে পারত না বা ধরণিপুর চা-বাগিচার শ্রমিক পরিবারের সন্তানসন্ততিদের মাধ্যমিক পাশের অদম্য জেদকে স্যালুট জানাতে ১০০ শতাংশ পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য সুদূর কোচবিহারের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মাস্টারমশাইরা ছুটে আসতে পারতেন না।

বন্ধ বাগিচা শ্রমিকদের পরিবারগুলোর পাশে কতজন যে কতরকমভাবে আছেন, তার প্রমাণ 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'। জলপাইগুড়ি এলআইসি-র এটি একটি প্রোজেক্ট, যেটি নিয়ে ছুটে চলেছেন অর্পিতাদি। অর্পিতা বাগচী। প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য, বন্ধ চা-বাগিচার কিছু ছাত্রছাত্রীর পাশে ধারাবাহিকতা নিয়ে দাঁড়ানো। যোগাযোগ হল 'এখন ডুয়ার্স'-এর মাধ্যমে আমার সঙ্গে। যেহেতু বাগিচা ঘুরে সার্ভে করছি, অর্পিতাদি তাই সাহায্য চাইলেন। দু'-তিনজন বন্ধ বাগিচা শ্রমিক পরিবারের অত্যন্ত দরিদ্র এবং মেধাবী, যাদের আর্থিক কারণে পড়া বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। সেরকমই পরিবারের কয়েকজনকে উনি সাহায্য করতে চান, আমাকে কয়েকজনের তালিকা দিতে হবে। উনি এবং ওঁর টিম এসে সার্ভে করে বাছাই পর্ব শেষে প্রথম বছর তিনজনকে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করে যাবেন। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ওদের চাহিদাভিত্তিক ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। অভিভূত হয়ে গেলাম। এত মহৎ প্রচেষ্টা? গর্ব হল, 'এখন ডুয়ার্স'-এর সম্পাদক এরকম একটা দায়িত্ব দিয়েছেন বলেই না এত বড় সামাজিক কাজের আর একটা গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ল। কয়েকদিন আগেই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রেড ব্যা ঙ্ক চা-বাগিচায় সমীক্ষা করতে গিয়ে ডায়না নদীতে কিশোর-কিশোরীদের পাথর ভাঙার হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে এসেছিলাম। সেখানেই কথা বলেছিলাম জয়ন্তির সঙ্গে। বাপ-মা মরা মেয়েটা দাদার বাড়িতে থেকে বানারহাটের একটি হিন্দি মিডিয়াম স্কুল থেকে সেবার মাধ্যমিক দেবে। তিন দিন স্কুলে যায় আর বাকি তিন দিন স্কুলে যাওয়ার বাস ভাড়া হাতখরচ তোলার জন্য ডায়না নদীতে পাথর ভাঙে। লিখেছিলাম ওদের করুণ ইতিহাস 'এখন ডুয়ার্স'-এর ধারাবাহিক কলামে।

এলাম আমরা ওদের বাড়িতে 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'-এর অর্পিতাদি, রঙ্গনসহ আরও অনেকের সঙ্গে। গেলাম চ্যাংমারি হাই স্কুলে পাঠরতা সনিয়াদের বাড়িতে। আরও অনেকের বাড়িতে। সাহায্য করলেন চ্যাংমারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা। অবশেষে নির্বাচিত তিনজনের পড়াশোনার খরচ বাবদ প্রতি মাসে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০০০ টাকা করে অর্থ বরাদ্দ করেছে 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'। হ্যাটস অফ 'টু লিভস অ্যান্ড এ বাড'। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাই।

'এখন ডুয়ার্স' পাক্ষিক। ফলে ঘটনাক্রমে এত দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়েছে যে, সব তথ্য সবসময়ে সন্নিবেশিত করতে পারিনি। কারণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস জুড়ে মজুরি এবং বোনাস পর্ব মিটতে না মিটতেই নভেম্বর মাসে ডিমনিটাইজেশনের ফলে বাগিচাশিল্পে এক নতুন সংকট। শুরু হল এক নতুন ধরনের আর্থিক সমীক্ষা। ডুয়ার্সের বীরপাড়ার হাটে দাঁড়িয়ে দেখলাম, হাফপ্যান্ট পরা শীর্ণদেহ শ্রমিকের হাতে ধরা দু'হাজারির নোট আর চোখভরা অশ্রু। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত সে ওই নোটটি

আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা

চা বাগিচায় করম পুজোর নৃত্য

কোথাও ভাঙাতে পারেনি। বীরপাড়াতেই আবার চোখে পড়েছে গ্রামীণ হাটুরে দ্রব্য বিক্রি করে খুচরো দিতে পারছে না বলে জনৈক ক্রেতাকে কাগজের ডিউ স্লিপ দিতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে অন্তহীন বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ডিমনিটাইজেশনের প্রত্যক্ষ ফলাফল পড়ল ডুয়ার্সের বাগিচাশিল্পে। সেই সূত্রেই পরিচয় হল প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক গবেষক, বাগিচা বিশেষজ্ঞ এবং টাই-এর ডুয়ার্স ব্রাঞ্চের সম্পাদক রাম অবতার শর্মার সঙ্গে। নিবিড়ভাবে পেলাম জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অনাদিবাবুর মতো দক্ষ ম্যানেজারদের, পোস্ট অফিস, জলপাইগুড়ির তৎকালীন মহকুমাশাসক বন্দনা যাদবকে, যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বাগিচাগুলোতে ডিমনিটাইজেশনের প্রভাব সামলানো গিয়েছিল। এঁদের কাছ থেকে প্রতিটা ক্ষেত্রে এত তথ্যগত সহযোগিতা পেয়েছি যে হ্যাঁ, আমরা 'এখন ডুয়ার্স' গর্ব করে বলতে পারি, জেলা প্রশাসনের প্রতিটি কর্মসূচি, বাগিচা শ্রমিকদের সমস্যা, ম্যানেজমেন্টের মজুরি প্রদানের দুশ্চিন্তা, মালিকপক্ষের অসহায়তা, ব্যাঙ্ক প্রযুক্তির ব্যর্থতা এবং ডিমনিটাইজেশনের আপাত বিফলতার চিত্র ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছি 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। সকলেই হয়ে গিয়েছেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর আত্মার আত্মীয়। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলাই যায় ডিবিআইটিএ-এর সুমন্ত্র গুহঠাকুরতার কথাই। রুমা গুহঠাকুরতা, বুদ্ধদেব গুহদের বনেদি ঘরানার আভিজাত্যের ছাপ সর্বাঙ্গে। অথচ সদালাপী, মাটির মানুষ, নিরহংকারী মানুষটির সঙ্গে যখন আলাপচারিতায় বসলাম, তখন দেখলাম, কী সাবলীলভাবে ডুয়ার্সের বাগিচা সংকটকে আমার সামনে তুলে ধরলেন তিনি এবং প্রতিটি অর্থনৈতিক কাঠখোট্টা বিষয়কে সহজ সরলভাবে তুলে ধরলেন। জলপাইগুড়ির হতশ্রী চা নিলামকেন্দ্র আমরা যাকে বলি, সেই আইটিপিএ ভবনে অমিতাংশু চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখলাম, মালিকপক্ষের প্রশাসক প্রতিনিধি হলে কী হবে? শ্রমিক তথা বাগানবাবু স্টাফদের ক্ষেত্রেও সমভাবে উদ্‌বিগ্ন অমিতাংশুবাবু। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে সমালোচনা করতেও যেমন পিছপা হননি, তেমনই অত্যন্ত খোলামেলা বক্তব্য রাজ্য সরকার বা টি বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও। ক্ষুদ্র চায়ের বিজয়গোপাল চক্রবর্তী একাধারে যেমন জমিয়ে রাখেন হাসি-ঠাট্টা-মজার মধ্যে দিয়ে, অন্য দিকে ক্ষুদ্র চায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে ক্ষুদ্র চা সম্পর্কিত বিষয়ে ভীষণ সিরিয়াস। প্রকৃতই ক্ষুদ্র চায়ের দিকে ভারতীয় অভ্যন্তরীণ বাজার যেভাবে ঝুঁকে গিয়েছে, তাতে আগামী দিনে বৃহদায়তন বাগানগুলো আরও সমস্যায় জর্জরিত না হয়ে পড়ে! এঁরা সকলে ধারাবাহিকভাবে তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন আমার লেখনীকে।

সমস্যায় জর্জরিত শ্রমিকসমাজ। যত শ্রমিক বাগিচায়, ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেকগুলোই। তবুও মালিকপক্ষর উপর চাপ সৃষ্টি একমাত্র জয়েন্ট ফোরামই করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। জয়েন্ট ফোরামের শীর্ষনেতৃত্ব জিয়াউল আলম এবং মণিকুমার দার্শাল ধারাবাহিকভাবে চা শ্রমিকদের নিয়েই আছেন। তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে লকুল সোনার বা অন্যান্য শীর্ষনেতৃত্বও লড়াই চালাচ্ছেন। প্রভাত মুখার্জির বাগিচা বলয়ে পরিচিতি বাবলু মুখার্জি নামেই, এ ছাড়াও অমরনাথ ঝাঁ, মোহন শর্মা, সুকরা মুন্ডা, সদ্য কংগ্রেস থেকে আগত যোসেফ মুন্ডা, বিজেপি শিবিরের জন বারলা, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের তেজকুমার টোপ্পোরা নিজের নিজের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে লড়াই চালালেও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বহুধাবিভক্ত। জয়েন্ট ফোরাম নেতৃত্ব ন্যূনতম মজুরির দাবিতে অনড়, শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের দাবি অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি। এক বছরের বাগিচা শ্রম আইনের ঘাত-প্রতিঘাতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন তাই এখনও বাস্তবায়িত হল না। এখন চলছে বোনাসের প্রস্তুতি। আর আসছে পুজো। পাহাড়ের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সেকেন্ড ফ্লাশ কার্যত সংকটে। তবুও হয়ত বোনাস মিটিং হবে। এক বছরের যাত্রাপথে প্রত্যেক পক্ষে যে সকল শ্রমিক আন্দেলনের নেতৃত্বকে বাগিচা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করেছি, সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সকলকেই জানাই আসন্ন শারদোৎসবের প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা।

'এখন ডুয়ার্স'-এর বর্তমান সংখ্যা শারদ সংখ্যা। ভীষ্মলোচন শর্মার পক্ষ থেকে সম্পাদকীয় দপ্তরসহ পত্রিকার সমস্ত লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল শারদোৎসবের শ্রদ্ধা। শেষ করার আগে চা-বাগিচার পুজো নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছি না; কারণ ডিমনিটাইজেশনের সুবাদে নভেম্বর '১৬ সংখ্যায় বাগিচা পরিক্রমা করে ডুয়ার্সের দুর্গাপুজোর কোনও প্রতিবেদন বা বাগিচার পুজো সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে পারিনি, একটা কাঁটা থেকে গিয়েছিল বুকের মধ্যে। এবারের শেষ পর্বে খুব সংক্ষেপে একটা চালচিত্র তুলে ধরছি। প্রকৃতপক্ষে বাগিচা অঞ্চলের দুর্গাপুজোর চালচিত্র খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বিস্মৃত অতীতের গভীরে। অতীতের যোগাযোগবিহীন অখ্যাত নির্জন, বন্য শ্বাপদসংকুল ডুয়ার্স প্রাঙ্গণে কবে, কোথায় দুর্গাপুজোর প্রচলন ঘটেছিল, তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া বড়ই কঠিন। কারণ দুর্গাপুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় উপলক্ষ নয়। সর্বধর্মসমন্বয়ে দুর্গাপুজো হয়ে থাকে বাগানে বাগানে এই শরৎকালের শারদোৎসবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ডুয়ার্সে কে বা কারা কোন অঞ্চলে দুর্গাপুজো শুরু করেছিল তা সঠিকভাবে সালতামামি করা কঠিন ব্যাপার। বাঙালি মালিকানার চা-বাগিচাগুলোতে প্রথম থেকেই দুর্গাপুজো হত। কারণ ইউরোপীয় মালিকানার বাগানগুলোতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো পুজোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করত না। ১৯৪১ সালে মেটেলি কালীবাড়ি কমিটির পরিচালনায় প্রথম দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। আর চা-বাগিচায় পুজোগুলোর মধ্যে ডিমা চা-বাগিচার করণিক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যর উদ্যোগে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। ইংরেজ পরিচালিত বাগানে

নগণ্য সংখ্যায় দুর্গাপুজো হত। ধীরে ধীরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং চা-বলয়ে দুর্গাপুজোর ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছিল। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে চা-বাগিচায় তিন দিনের সবেতন ছুটি শ্রমিক-কর্মচারীদের মনে এনে দিল অভাবনীয় আনন্দ। চা-বলয়ে দুর্গাপুজোর প্রথম সূত্রপাত যেভাবে ঘটুক না কেন, পরবর্তীকালে ডুয়ার্সের শারদোৎসব সর্বধর্মসমন্বয় স্থাপন করেছিল।

যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাসকারী জনমানসের মানসিক বিবর্তন ঘটতে থাকে। আধুনিকতার ছোঁয়া ক্রমবর্ধমানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চা-বাগিচার পরিচালন, কর্মসংস্কৃতি চা-বাগিচার জনজীবনকে এক নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। অভাব ছিল, কিন্তু মানসিক শান্তির ছন্দে বিঘ্ন ঘটার সুযোগ ছিল না। চা-বাগিচার সকল স্তরের মানুষের, যে শ্রমিক থেকে শুরু করে বাবু বা সাব-স্টাফ বা অস্থায়ী শ্রমিক হোক না কেন, তাদের নানা ধরনের দুঃখকষ্ট, অভাব ছিল ঠিকই; কিন্তু মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ছিল, জীবনপথে চলার উদ্যম ছিল। কিন্তু কালে কালে বাগিচা থেকে 'সুখ' শব্দটি অন্তর্হিত হল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাভাবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও দেখা দিল 'বেনিয়ার সংস্কৃতি'। কারণে-অকারণে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া, বেতন না পাওয়া, ঘরবাড়ি ঠিকমতো মেরামত না করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল, দিনের পর দিন বন্ধ রইল রেড ব্যা ঙ্ক, ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি, মধু, রায়মাটাং, রামঝোরা, কালচিনির মতো বাগানগুলো। অথচ কোনও এক সময়ে এই বাগানগুলো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। তীব্র আর্থিক অনটনকে উপেক্ষা করে এই সে দিনও রেড ব্যা ঙ্ক বাগানে দুর্গাপুজোর ব্যবস্থা হয়েছিল। অনিশ্চয়তার প্রবল বাতাবরণে হয়ত এখন আর সম্ভব নয় ডায়না নদীর পাথর-ভাঙা শ্রমিকদের বা পরবর্তী চ্যাংমারি, ডায়না অথবা দেবপাড়ায় ঠিকা ভিত্তিতে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের, যাদের অনেকেই ছিল রেড ব্যা ঙ্কের স্থায়ী শ্রমিক। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাগানে বাগানে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বোধহয় হারিয়েই গেল।

ডুয়ার্সের চা-বাগিচার দুর্গাপুজোয় আর ভিড় টানে না গয়েরকাটা, বানারহাট, বীরপাড়া, মালবাজার, মেটেলি, কালচিনি, হাসিমারা, জয়গাঁ অথবা বারোবিসা, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির হাট বা বাজারগুলো। বছর পাঁচ-ছয়েক আগেও মাদল, নাগরা, ঝাঁপ ও বাঁশি বাজাতে বাজাতে বলিষ্ঠ যুবক সাঁওতাল, ওরাওঁ অথবা মদেশীয়া যুবকরা রঙিন শাড়ি পরিধান করে, সাদা ধুতির পুরোটাই পাকিয়ে মাথায় জড়িয়ে হাতে ময়ূরের পুচ্ছ নিয়ে মাদলের তালে তালে নেচে যেত। জলপাইগুড়ির রাস্তায় দেখেছি, মাদলের তালে তালে নাচতে নাচতে চকিতে থেমে গিয়ে সকলের হাতের ময়ূরপুচ্ছের গোছা উঁচুতে তুলে ধরত আর অদ্ভুত সুরমূর্ছনায় বাঁশি এবং সমবেত যন্ত্রের সুরমূর্ছনায় ময়ূরপুচ্ছ নামিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু হত। আর এখনকার চিত্র? সন্ধ্যার দিনবাজার বা দুপুরের দিনবাজারে শুধুই শহুরে ক্রেতাদের ভিড়। গ্রামীণ বাগিচা শ্রমিক কোথায়? মজুরি নেই, বোনাসও হয় একেবারে পুজোর আগে আগে। মহাজনের ধার মেটাবে, না জামাকাপড় কিনবে শ্রমিকরা? কিন্তু দুর্গাপুজো এমনই এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল যে, যতই কষ্ট হোক, মায়ের পুজোয় 'দুধে-ভাতে' না হোক, 'মাছে-ভাতে' না হোক, অন্তত এখনও 'শাকে-ভাতে' বেঁচে আছে শ্রমিকসমাজ। ধুঁকতে ধুঁকতে একশো ছাব্বিশ টাকা দৈনিক মজুরির জাঁতাকলে হিসাব কষেই চলতে হচ্ছে সংসারের হাল ধরার লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদেরই। পুরুষ শ্রমিকরা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের তাড়নায় চলে যাচ্ছে ভুটানে, দিল্লিতে, বেঙ্গালুরুতে, দক্ষিণ ভারতে, পরিবারের বাবা-মা ছাড়া আরও এক প্রজন্ম প্রবেশ করছে বাগিচার অন্তঃপুরে, ১২৬ X ৩ = ৩৭৮ টাকা প্রতিদিন প্রতিটি পরিবারের রোজগার। হাঁড়িয়া বা দেশি চুল্লু খেয়ে বুঁদ না হয়ে থাকলে সংসারে অভাব থাকার কথা নয়। বাগানে সার্ভে করতে গিয়ে রেড ব্যাঙ্ক, বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, ধরণিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন বাগিচার অনেক পরিবারের বাড়িতে দেখেছি ডিশ অ্যান্টেনা। মনে প্রশ্ন জেগেছে, খেতে না-পাওয়া শ্রমিকের বাড়িতে ডিশ অ্যান্টেনা? বন্ধ বাগিচার শ্রমিক পরিবারের অনেকের বাড়িতেই চোখে পড়েছে মোটরবাইক। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বাগানে চলছে ঘোরতর লুটপাট। চেহারায় উজ্জ্বলতা, জিন্‌সের প্যান্ট, শর্ট শার্ট আর ব্র্যান্ডেড কোম্পানির জুতোতে শোভিত শ্রমিক পরিবারের ছেলেছোকরাকে হাঁড়িয়া খেতে দেখেছি লঙ্কাপাড়াতে প্রবেশের মুখে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়াসহ ডানকানসের বাগানে শেড ট্রি-সহ গাছ প্রায় শেষ। তুলসীপাড়াতে শ্রমিকরা ঢুকতে দেয়নি মন্ত্রী জেমস কুজুর-সহ ডানকানসের প্রতিনিধিদের। তাদের সঙ্গে কথা না বলে চা-বাগান খোলা যাবে না। এত বড় সাহস শ্রমিকরা পেল কোথা থেকে— এটাও বিচার্য বিষয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আছে বড় ধরনের রাজনৈতিক মদত এবং জমি দখলের লড়াই। লঙ্কাপাড়া বাগানের চা গাছগুলো হটিয়ে বাগানের জমি দখল করে 'ভূপালি বসতি' গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে বিশাল 'স্কিম' চালাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী ভুটান থেকে আগত নেপালিরা, তা কি জানেন না আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন অথবা কালচিনির মানুষজন? অথব বীরপাড়া-কালচিনির নেতারা? যদি না জেনে থাকেন তাহলে অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদনে আগামী দিনে 'এখন ডুয়ার্স'-এই প্রকাশিত হবে চা-বাগিচার অন্ধকারময় দিকগুলোর তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন।

বোনাস পর্ব সাঙ্গ। উৎসবের আনন্দে বাগিচা শ্রমিকেরা

খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আছে বড় ধরনের রাজনৈতিক মদত এবং জমি দখলের লড়াই। লঙ্কাপাড়া বাগানের চা গাছগুলো হটিয়ে বাগানের জমি দখল করে 'ভূপালি বসতি' গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে বিশাল 'স্কিম' চালাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী ভুটান থেকে আগত নেপালিরা, তা কি জানেন না আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন অথবা কালচিনির মানুষজন?

সমাপ্ত

দেবপ্রসাদ রায়

সন্ত্রাসের পর পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট। লেখক বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের কথা ভাবছেন। ‘পাওয়ার টু পিপল’ নামের বিলটি মাত্র চার ভোটে বাতিল হল। ওদিকে আবার ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঘণ্টা বেজে গেছে এই রাজ্যে। খুব আশা যে সরকার বদলাবে। ফালাকাটার দলীয় প্রার্থী নিয়ে জমে উঠল নাটক। রাত একটায় ফোন করে সাংবাদিক বলছে, ফালাকাটার প্রার্থী কেন বদলে গেল? লেখক চিন্তিত। বদলে যাওয়ার কথা স্বীকার করছে না কেউ। প্রিয়দা বলছেন, আমাকে কি পাগল কুকুরে কামড়েছে? তারপর এক রহস্যময় রেডিওগ্রাম। ক্ষমতা ও রাজনীতির অন্দরে লুকোন কাহিনির উন্মোচন এবারের পর্বে।

।।৪৩।।

দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি শুরু হল। এবার ঠিক করাই ছিল, প্রথম কর্মসূচির দুর্বলতা মাথায় রেখে এবারের কাজটা শুরু করতে হবে। যুব কংগ্রেসের প্রশিক্ষিত ছেলেরা ভাল কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু দলের মূলস্রোতকে প্রভাবিত করতে পারছিল না। ফলে, প্রশংসার চেয়ে অভিযোগের পাল্লাটাই ক্রমশঃ ভারী হচ্ছিল। যতদিন রাজীবজী নিজে দলের দায়িত্বে থেকে ছেলেদের কথা শুনেছিলেন, তত' দিন তেমন কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু উনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়াতে, ছেলেদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এক ধাক্কায় ২২টা নমিনেশন ৫ রাজ্যে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। সবাই তখন আতঙ্কিত। কখন কা'র টিকিট কাটা যাবে, আর ডি পি-র ছেলেরা ওপর থেকে ‘স্কাইল্যাবের’ মতো পড়বে (এভাবেই বলা হ'ত বলে শুনেছি) তা' নিয়ে সবাই উৎকণ্ঠিত থাকত। আমার আজ মনে হয় আমারও ত্রুটি ছিল। নরম মানসিকতার মানুষ বলে ছেলেদের বিরুদ্ধে শুনতে চাইতাম না। ফলে মুড়ি আর মিছরির একইভাবে মূল্যায়ন হওয়াতে ছেলেদের ভেতরও একটা ক্ষোভ জন্মেছিল। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো '৮৫-র নির্বাচনের আগে রাজীবজী আর অরুণ নেহেরু বললেন, আমেথি আর রায়বেরিলীর জন্য ৩০ জন ‘ক’ শ্রেণীর ছেলে চিহ্নিত করে দাও। ওরা ১৫ জন করে একটা একটা ক্ষেত্রে কাজ করবে। যারা বাদ গেল, তারা ভাবল ওদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হল। অন্ধ্রপ্রদেশের কাগজনগরে নরসিমা রাওয়ের কাছের লোক বেঙ্কটেশ্বরালুকে (সিটিং এমএলএ) কেটে জনক প্রসাদকে টিকিট তো আমি দিতে বলিনি। কিন্তু তার জন্য নরসিমা রাওয়ের পাঁচ বছর আমার জন্য পিএমও-র দরজা বন্ধ ছিল।

সতর্কতা ছিল। তাই ঠিক করলাম, প্রথম থেকেই দলের মূলস্রোতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে এবার এগতে হবে। ঠিক হল রাজ্যগুলোর রাজধানী শহরগুলোতে গিয়ে দলের প্রধান কার্যালয়ে দলের কোনও একজন সাধারণ সম্পাদককে পাশে বসিয়ে প্রতি জেলা থেকে জেলা কংগ্রেসের কোনও একজন সাধারণ সম্পাদককে নির্বাচিত করে Trainer's Campe-এ ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, দলের বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণের ধারাটাকে যাতে সব সময় সচল রাখে। কারণ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বলেছে, দলের প্রতিটি সক্রিয় সদস্যকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

চয়ন প্রক্রিয়া শুরু হল। কিন্তু দেখা গেল, জেলাস্তরের পদাধিকারীরা এই ১৫ দিনের শিবিরে আসতে রাজি নন'। কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না। একটা সমঝোতা সূত্র বের করা হল যে, নির্বাচিত কর্মীটিকে প্রশিক্ষণের পরে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক করে দলের মূলস্রোতে যুক্ত করা হবে। এবার ঠিক হল, দিল্লিতে নয়, রাজ্যগুলোতে বিভাগীয় স্তরে শিবিরগুলি রূপায়িত হবে। প্রথম শিবির শুরু হল মধ্যপ্রদেশের ইটারসির কাছে ‘তাবা নগরে’।

অর্জুন সিং ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হয়ে চলে গিয়েছেন, এবং মোতিলাল ভোরা মুখ্যমন্ত্রী। প্রদেশ সভাপতি

দিগ্বিজয় সিং। তাবা নগর আসলে তাপ্তী নদীর উপর বিস্তীর্ণ একটি ড্যাম। প্রচুর মাছ হয়। সব কলকাতায় চালান হয়ে যায়। শিবিরে নিরামিষ। আমি খাচ্ছি। তবে মাছের রাজ্যে বসেও পালা করে নিরামিষ খেতে হচ্ছে, আমি তার জন্য খানিকটা বিমর্ষ অবশ্যই ছিলাম। দু'দিন পর রাতে সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার ঘরের দরজায় কেউ টোকা মারছে। আমি ভাবলাম, এত রাতে কে? শিবিরে তো দশটায় বাতি নিভে যায়, কারণ ৫টায় উঠতে হয়। খুলে দেখি, স্থানীয় বিধায়ক কাকো ভাই। হাতে একটা ডাব্বা। আমি একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বলি, 'কী ব্যাপার, তুমি এতো রাতে?' কাকো ভাই বলল, 'একজন বাঙালি আমার অতিথি, আর সে মাছ খাবে না, তা' হতে পারে না। তুমি ক্যাম্পের কিচেন থেকে ভেজ খাবার আনিয়ে নেবে, আমি রোজ মাছ নিয়ে আসব। এখানে আশ্রম খুলতে আসনি।' বলতে লজ্জা নেই— এ লোভ আমি সামলাতে পারিনি এবং বাকি দিনগুলোর রাতের ব্যবস্থা এটাই হয়ে থাকল।

মাঝরাতে একদিন ভোরাজী এলেন, কেমন চলছে, জানতে-দেখতে। ছেলেরা প্রাণ খুলে আড্ডা দিল। সিএম-কে এভাবে কখনও পায়নি। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, ওরা অনুরোধ করেছে, নিজের নিজের জেলায় বিশসূত্রী কমিটিতে ওঁদের যাতে স্থান হয়, আমি অবশ্যই তা' নিশ্চিত করব। যদিও যুব কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেটররা যে যে জেলায় ছিল, সেই জেলাতে যে ২০ দফা রূপায়ণ কমিটির মনোনীত সদস্য ছিল, কিন্তু এদের তো তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না, এরা রাজনীতির আঙিনায় কাজ করবে, তা হলে এরা এই সুযোগ চাইবে কেন? আমি শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করলাম। রাতে ভজন সিং নিরাঙ্কারী এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল— আমিই এই প্রস্তাব দিয়েছি। আপনি সিএম-কে ফোন করে মানা করে দিন। ও' পরে ভিলাই থেকে এমএলএ হয়েছিল। বলার উদ্দেশ্য হল, দলের ভেতর এই মানসিকতা তৈরি করতে পেরেছিলাম এবং চেষ্টা করলে আজও করা যায়।

ইতিমধ্যে রাজীব-লোঙ্গোয়াল চুক্তির ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাবে ৮ বছর পর নির্বাচন হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল। যুব কোঅর্ডিনেটরদের তিনজন টিকিট পেয়েছিল। রাজপুরায় নরেশ মেহতাব, বারনালায় হরদীপ গোয়েল আর আনন্দপুর সাহিবে গুরবীর সিং। আমি তখন সরাসরি এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত নেই। 'ট্রেনার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম' দেখছি। বলে না, 'ম্যায় তো কমলী ছোড় রহা হু, লেকিন কমলী মুঝে নেহি ছোড় রহা হ্যায়।' কেন ওরা টিকিট পেল, তার জন্য আমার আবার কিছু শত্রু বাড়ল।

যাই হোক, আমি কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিয়ে ১৭ দিন ছিলাম। দ্বিতীয় দিনেই অর্জুন সিংজী (তখন গভর্নর) আমাকে ডেকে পাঠিয়ে একটা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। যদিও আমাকে বেশি বের হতে' হত' না। তবু যে তিনটে ছানা লড়ছে, তাদের কাছে যেতেই হত। নরেশ মেহতাবের বাবাও টিকিটের দাবীদার ছিলেন। ছেলে কেন পেল, তার জন্যও তার রাগ। তাই ছেলের জয়ের চেয়ে, ওকে সামনে রেখে কীভাবে পয়সা তোলা যায়, উনি তাতেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। গুরবীর আসনটা পেয়েছিল সিটিং এমএলএ-কে বঞ্চিত করে— বসন্ত সিং। তার একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল কী করে গুরবীরকে হারানো যায়।

হরিয়ানা, পাঞ্জাবে বড় কোনও রাজনৈতিক দলের টিকিট পেলে, জিতুন আর নাই জিতুন, যা অর্থ সংগ্রহ হয়, তা'তে দশ বছর পায়ের উপর পা তুলে খাওয়া যায়। তাই যে কোনও মূল্যে টিকিট নেয়ার জন্য বিনিয়োগ করাটাও এ সব রাজ্যে সব দলের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ত্রাসের বাতাবরণে ভোট লড়া কঠিন ছিল। আরও কঠিন ছিল দলের কর্মী সেজে কে উগ্রবাদী হয়ে সব নিকেষ করে দিয়ে চলে যাবে। ভীষণ সতর্ক থাকতে হত'। এবং সতর্ক রাখতে হত' তাঁদেরও, যাঁরা প্রচারে আসতেন। একদিন আনন্দ শর্মার ট্যুর প্রোগ্রাম পেলাম। সব মিলিয়ে ৯টা সভা করবে। প্রথম দিন চারটে, পরের দিন পাঁচটা। মাঝে জলন্ধরে নাইট হল্ট। প্রথা অনুযায়ী ডিআইজি সিকিউরিটিকে জানিয়ে দিলাম, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেবার অনুরোধ জানিয়ে। রাতে আনন্দের ফোন। 'দাদা, ইহা সার্কিট হাউস মে সিকিউরিটি কী ইত্না কমী! অভি বলিয়ে, ঠিক সে ব্যবস্থা করে।' ডিআইজিকে ফোন করলাম। উনি জানালেন, 'একটা পাইলট কার ওর সঙ্গে ঘুরছে। ন'জন গানম্যান সর্বক্ষণের জন্য দেওয়া আছে, তারপরও যদি ওনার মনে হয়, সিকিউরিটি কম, তা হলে ওনাকে বলুন দিল্লি চলে যেতে।' যদিও এটা পরে আমি ওকে জানাতে পারলাম না।

সেবার সুরজিৎ সিং বারনালার সরকার হয়েছিল। কংগ্রেস ২৫টা আসন পায়। পরে জনান্তিকে শুনেছি, এটা নাকি ঠিক করাই ছিল। অকালীর সরকার হবে। কারণ খালিস্থানী আর কেন্দ্রীয় সরকারের মাঝখানে অকালীকে 'বাফার' হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। সত্যি কি না, তা পরখ করার কোনও সুযোগ কখনও হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু তার পরের পাঞ্জাব আরও ভয়াবহ ছিল। সে কথায় পরে আসব।

তাবা নগরের পরের ক্যাম্পটা ছিল লিবাসপুরে, দিল্লিতে। সব ক্যাম্পেই একজন 'ক্যাম্প কমান্ডার' মনোনীত হতেন। নিয়মশৃঙ্খলা তিনিই দেখতেন। প্রথম ক্যাম্পে অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে এ কাজটা করতে পারাতে সেবাদলের জাতীয় সর্বাধ্যক্ষ রামেশ্বর নিখরাকে এখানেও এই দায়িত্ব অর্পণ করা হল। উনি আমার মতো শিবিরে থাকতেন না, কিন্তু ভোরবেলা পিটি শুরু হওয়ার আগেই পৌঁছে যেতেন। এই শিবিরে মূলতঃ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলো থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা এসেছিল। পাঞ্জাব, হিমাচল, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর। রাজীবজী উদ্বোধন করলেন। ছোটির বয়স তখন (আমার মেয়ে) মাত্র ২৪ দিন। মায়ের কোলে শুয়ে থাকত, পাশের এক পেট্রল পাম্পের পেছনের ঘরে। আমি সব কাজ মিটিয়ে একবার দেখে আসতাম। তারপর ওরা বাড়ি চলে যেত।

ট্রেনার্স ট্রেনিং ক্যাম্পের পার্টিসিপেন্টরা কেউই কচিকাঁচা নয়। সবাই পরিপূর্ণ যুবক, অথবা তার চেয়েও বেশি। সভাপতি উপাধ্যায় বলে জৌনপুরের একজন প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন, তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। আর উমাশঙ্কর ত্রিবেদীর বয়স ছিল ৬০-এর উপর। বদায়ুনের মালখান রাম ৫৬ বছরের। তাঁদের প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে ট্রিট করা বা তাঁদের আমাকে শিক্ষক হিসাবে মেনে নেওয়া, খুব সহজ কাজ ছিল না। যদিও সব শিবিরেই মূলতঃ আমার রোলটা থাকত ম্যানেজেরিয়াল। তবে সার্কাসের জোকারকে যেমন সব খেলা জানতে হয়, আমাকেও তেমনই সব বিষয়ে কিছু না কিছু জেনে রাখতে হত', কারণ সব ফ্যাকাল্টি সব সময় টার্ন আপ করত না। তখন আমাকেই হাল ধরতে হত'। কিন্তু এখানেও সেই ব্যাপারটাই আসল ছিল। দলের জাতীয় স্তরের সচিব

সন্ত্রাসের বাতাবরণে ভোট লড়া কঠিন ছিল। আরও কঠিন ছিল দলের কর্মী সেজে কে উগ্রবাদী হয়ে সব নিকেষ করে দিয়ে চলে যাবে। ভীষণ সতর্ক থাকতে হত'। এবং সতর্ক রাখতে হত' তাঁদেরও, যাঁরা প্রচারে আসতেন। একদিন আনন্দ শর্মার ট্যুর প্রোগ্রাম পেলাম। সব মিলিয়ে ৯টা সভা করবে।

একাত্ম হয়ে থাকছে, দিনের সব কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে, কখনও শিবির ছেড়ে যাচ্ছে না, আমার এই মানসিকতা ওঁদের মনে একটা ছাপ ফেলত।

লিবাসপুরে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। সৌগতদা পড়াতেন 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তার মতাদর্শ'। তিনি পড়াচ্ছেন, দিল্লির চিফ একজিকিউটিভ কাউন্সিলর (CM-এর সমকক্ষ) শিবিরে এসে বসে পড়ানো শুনতে লাগলেন। ওনার নাম জগপরবেশ চন্দ্র— উনিও রাজনৈতিক দিক থেকে পড়াশোনা করা লোক বলেই দিল্লিতে পরিচিত ছিলেন।

সৌগতদা ঘটনাক্রমে বিজেপি-কে বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, এই দলটি মূলত ব্যবসায়ী ও পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের দল, বলাতে ওনার আঁতে ঘা লাগে, কারণ উনি নিজেও মূলতঃ পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু। উঠে দাঁড়িয়ে সৌগতদাকে থামিয়ে কিছু বলতে চাইলেন। আমি তার আগে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এই ক্লাসে যিনি পড়াচ্ছেন ও যাঁরা পড়ছেন তার বাইরে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কোনও বিষয়ে নাক গলাবার কোনও অধিকার নেই। আপনার যদি কিছু বলার থাকে, তাহলে ক্লাসের পর মিঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।' উনি একদম 'থ' মেরে গেলেন। আর কিছু না বলে চুপচাপ ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বহু অনুষ্ঠানে একে অপরকে দেখেছি, কিন্তু উনি আর কোনও দিন বাক্যালাপ পর্যন্ত করেননি। তখন বুঝিনি, আমি নিজের অজান্তে নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছি।

। ৪৪ ।

রাজীবজী প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে আসীন হওয়ার পরই রাজ্যে রাজ্যে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ কী চায় তা' জানতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলা তথা উত্তরবঙ্গে তিনি এই পরিক্রমায় এসেছিলেন। তখন প্রিয়দা রাজ্য সভাপতি। জলপাইগুড়ি জেলায় রাজীবজী মোট তিনবার এসেছিলেন বলে আমার খেয়াল আছে। প্রথম এলেন, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৬। সকাল ১০টায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মাঠে মিটিং হল। প্রায় ৪ লক্ষ লোক। আমার তখন খুব টেনশন। কারণ ততদিনে রটে গিয়েছে আমি রাজীবজীর ঘনিষ্ঠ। তাঁর কোনও নিদর্শন যদি জলপাইগুড়ির লোক না পায়, তাহলে একদম 'হ্যাটা' হয়ে যাব। রাজীবজী এলেন, মঞ্চের নীচে লাইন দিয়ে জেলার নেতারা ও চা শিল্পপতিরা দাঁড়িয়ে আছেন। রাজীবজী সবাইকে স্মিত হাসিতে মুগ্ধ করে দিয়ে মঞ্চের দিকে যখন পা বাড়িয়েছেন তখন আইটিপিএ থেকে একটা স্মারকলিপি ওনার হাতে দেওয়া হল। উনি বললেন, 'ডিপি এটা রাখো। পরে তোমার কাছ থেকে নেব।' '৮২ সালের ক্রান্তির কাঁটাটা মাঝে মাঝে বুকের ভেতর খচখচ করত, তা' যেন কেউ এত দিন পরে বের করে নিল। তখন প্রিয়দার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ভাল। তাই আমি হিন্দিতে স্বাগত ভাষণ দিলাম। কিষানবাবুর (কল্যাণী) দায়িত্ব ছিল ট্রাকগুলোকে পেমেন্ট করবে। তিস্তার ব্রিজে লোক রাখা ছিল যাতে মিথ্যে হিসেব দিয়ে কেউ টাকা না নিয়ে যায়। আমার যতদূর মনে পড়ছে, ৫২২ গাড়ি লোক শুধু ডুয়ার্স থেকে এসেছিল।

তারপর একবার এলেন, জনসম্পর্ক অভিযানে বীরপাড়ায় এন এইচ পি বাংলোতে লাঞ্চ করেছিলেন। সঙ্গে মণিশংকর আয়ার। জলপাইগুড়ি থেকে সড়কপথে কোচবিহার চলে গেলেন। ধূপগুড়ি ঢোকবার মুখে কিছু ইউ কে ডি-র সমর্থকরা কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

'৮৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস এ রাজ্যে খুব আশায় বুক বেঁধেছিল, এবার সরকার হবে। প্রিয়দা মন্ত্রী কাম সভাপতি, রাজীবজীর 'মিস্টার ক্লিন' ইমেজ অটুট, আর কলকাতা কর্পোরেশন হ'তে হ'তে হয়নি।

তৃতীয়বার এসেছিলেন নির্বাচনী প্রচারে। চারটি জনসভা করেছিলেন। ময়নাগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, কালচিনি। সে গল্পে পরে আসব।

প্রশাসনের উদাসীনতায় মানুষ যে গ্রামাঞ্চলে ন্যায্য পাওনাটি থেকে বঞ্চিত হয়, এই জনসম্পর্কের ভেতর দিয়ে তা' তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্রথম একটা প্রচেষ্টা শুরু হল, 'রেসপন্সিভ বুরোক্র্যাসি'। জেলাস্তরে প্রশাসনিক বৈঠক করে বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রশাসনকে কতটা জনমুখী হতে হবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হবে না, বুঝতে দেরী হয়নি। কারণ এদেশে হয়ত কোনওদিনই 'ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং' হবে না। তাই এখানে চেয়ারটা কাজ করে না। চেয়ারে আসীন মানুষটা কাজ করে। যার জন্য আমরাও বলি, কৃষ্ণমূর্তি সাহেবের মতো আর কোনও ডিএম আসবে না, বা রামচন্দ্রনের মতো আর কোনও এসপি আসবে না। এই ব্যর্থতার বাতাবরণেই নতুন চিন্তা এল, 'মানুষের ক্ষমতায়ন করো'। সেই ভাবনা থেকেই শ্লোগান 'পাওয়ার টু দ্য পিপল'। আর সংবিধানের ৬৪তম সংশোধন।

আমার তখন পণ্ডিচেরীতে দক্ষিণ ভারতের ক্যাম্প চলছে। হুইপ ছিল ভোটের দিন থাকতে হবে। চেন্নাই থেকে রাতের ফ্লাইট ধরে আমি আর নারায়ণ স্বামী (এখন পণ্ডিচেরীর মুখ্যমন্ত্রী) সোজা পার্লামেন্টে এলাম। রাত দু'টোয় ভোটিং হল। ৪ ভোটে বিলটা হেরে গেল।

তখন ভেবেছিলাম, এই পরাজয় হয়ত একদিক থেকে দলের জন্য ভাল বলে প্রমাণিত হবে। কারণ মানুষ বুঝতে পারবে, জনতার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে আসল অনীহা কাদের। 'রথযাত্রা' আর 'বাবরি মসজিদ' দেশের রাজনীতির অভিমুখটাকে অন্যদিকে যে ঘুরিয়ে দিয়েছিল— সেটা আর এক ইতিহাস। আমার সে ইতিহাস লিখবার বিষয় নয়। আমি আমার গল্প শোনাতে বসেছি।

'৮৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস এ রাজ্যে খুব আশায় বুক বেঁধেছিল, এবার সরকার হবে। প্রিয়দা মন্ত্রী কাম সভাপতি, রাজীবজীর 'মিস্টার ক্লিন' ইমেজ অটুট, আর কলকাতা কর্পোরেশন হ'তে হ'তে হয়নি। রাজীবজী চল্লিশটা মিটিং করেছিলেন। শুধু জলপাইগুড়িতেই চারটে। আমি তখন জেলায় মোটামুটি দলের কাছে প্রভাবশালী। অনুপমদা আমার সুপারিশে জেলা সভাপতি। তাই জেলার বারোটা আসনে জেলা কংগ্রেস যে নাম দেবে, তাই চূড়ান্ত হবে— এ নিয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। প্রিয়দার নিজস্ব প্রার্থী ছিল ভীষ্মদা। আলিপুরদুয়ার আসনে লড়বে। যদিও জেলার প্যানেলে পল্লব ঘোষের নাম ছিল। আমি বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু বাকি ১১টা আসনে জেলা যা চাইছে তা' তো হবে? প্রিয়দা বললেন, 'তুই নিশ্চিত থাক, তাই হবে।'

তাই হচ্ছিল। অজিতদা (পাঁজা) তখন পশ্চিমবাংলার থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটিতে আছেন। আমার তবু আশঙ্কা যায় না। শেষ অবধি সিইসি (highest decision making authority)-তেও লিস্ট পাশ হয়ে গেল। আর কোনও টেনশনের কারণ নেই। মনোয়ন দাখিলের শেষ তারিখও এগিয়ে আসছে। আমি তখন এআইসিসি-র ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের অধীনে যুগ্ম সচিব হিসাবেও কাজ করছি। যদিও আমার প্রশিক্ষণ বিভাগ (Dept. of Political Training) সরাসরি রাজীবজীর কাছে দায়বদ্ধ ছিল। তাই কাজের পরিসর ও ব্যাপ্তি আমার প্রায় একজন সাধারণ সম্পাদকের মতোই ছিল। কিন্তু জেলা হল শরীরের হৃৎপিণ্ড। তা'কে বাদ দিয়ে কোনও অঙ্গই তাৎপর্যহীন। তাই জেলাতেও কংগ্রেস করতে হচ্ছিল। আর একটা অভিমান সব সময় কাজ করত, '৭৭-৭৮ সালে যখন শুধু সমীর রায় আর সুবল মজুমদারকে নিয়ে শ্রীরাম সিংকে মাথায় রেখে ইন্দিরাজীর নামটাকে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছিলাম, আজ যারা দাবীদার হয়ে উঠছো তখন তোমরা কোথায় ছিলে? যখন

বুঝেছো, তিনি ফিরছেন, তখন তোমরাও ফিরেছো। তাই একটু তো তারতম্য থাকবেই। মনোনয়ন জমা দেবার শেষ হতে যখন দু'দিন বাকি, এআইসিসি থেকে লিস্ট বেরিয়ে গিয়েছে, তখন রাত ১টায় 'আজকালের' গৌতম লাহিড়ী ফোন করল। আপনার ফালাকাটার প্রার্থী বদলে গেল? আমি বললাম, তা কী করে সম্ভব! এআইসিসি-র formal announcement হয়ে গিয়েছে। এখন তো কেউ বদলাতে পারবে না। গৌতম বলল, 'ভাল করে খোঁজ নিন।' সকালবেলায় অজিতদার বাড়ি গেলাম। অজিতদা যদিও স্বীকার করলেন না কোনও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অন্য কথা বলছিল।

আমি ঝুঁকি না নিয়ে প্রিয়দার বাংলোতে চলে গেলাম। 'কোনও নাম কি বদলেছে?' আমার প্রশ্ন শুনে প্রিয়দা বলল, 'তোকে কি পাগল কুকুরে কামড়েছে?' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, Symbol letter কবে দেবে?' বললেন, 'আজ বিকেলের ফ্লাইটে যাচ্ছি, কাল সকালে পাঠিয়ে দেব।' পরশুর আগে সবাই পেয়ে যাবে। এখনও তো দু'দিন আছে। এতো চিন্তার কী? চিন্তা অন্য জায়গায় ছিল। তাই চান্স না নিয়ে চুপ করে বিকেলের ফ্লাইটের টিকিট কেটে নিলাম। সতর্ক থাকলাম, যাতে প্রিয়দা আমায় না দেখে। কলকাতায় ল্যান্ডিংয়ের পর ট্যারমাকে যখন প্রিয়দা গাড়িতে উঠছে, আমি পেছনের দরজা দিয়ে নেমে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমার জেলার Symbol-গুলো আমি নিয়ে যাব। কখন তোমার বাড়িতে আসব?' প্রিয়দা আমাকে ওখানে দেখবে ভাবতেই পারেনি। বলল, 'তুই কি এই ফ্লাইটে এলি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। এবার বলো Symbol নিতে কোথায় যাব?' বলল, 'নিজাম প্যালেসে রাত ১১টায় চলে আয়।' আমি '৬৭ সাল থেকে ঘর করছি, তাই এসব ক্ষেত্রে কী কর্তব্য তা জানা ছিল। তাই নিজাম প্যালেসে মেজদাকে, আলিপুর গেস্ট হাউসে (অস্থায়ী আস্তানা) কল্লোলকে এবং বাড়ির সামনে মাধাকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। সারা রাত কোনও খবর নেই। ইতিমধ্যে ওরা স্থান বদলাবদলি করে নিয়েছে। মাধার বদলে বাড়ির সামনে মেজদা (বাবলুদা)। সাড়ে ন'টায় ফোন এল, 'বাড়িতে ঢুকল, তুই কি আসবি?' আমি এক মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে সোজা টাকি হাউস। গিয়ে দেখি, প্রিয়দা একঘর লোকের ভেতর বসে আছে, আর মালদার বাচ্চুদাকে প্রবোধ দিচ্ছে, কারণ শেষ পর্যায়ে এসে বরকতদা ওর টিকিটটা কেটে দিয়েছে।

আমি ঢুকতেই প্রিয়দা বললেন, 'এই তো মিঠু এসে গিয়েছে। ও' মালদা যাবে। গিয়ে যদি মনে করে তোর ওপর সত্যিই অবিচার হয়েছে, আমি তোর জন্য নতুন করে লড়ব।' আমি বললাম, 'মিঠু মালদা যাবে না। ও Symbol নিয়ে জেলায় যাবে। বাগডোগরার টিকিট কাটা আছে।' প্রিয়দা উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'সিম্বল দেব না বলেছি না কি? এই তো ভীষ্মদা বসে আছে। তোর সঙ্গে ও'ও যাবে।' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই, ওর সিম্বল ওকে দিয়ে দাও। বাকি ১১টা আমায় দাও।' তখন টাকি হাউসের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাতে ফোতেদারের ফোন এসেছিল। ফালাকাটা রিথিঙ্ক করতে বলেছে।' আমি বললাম, 'আমি সকালবেলাই ফোতেদার সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বলেছেন, কোনও বদল নয়।' প্রিয়দা বললেন, 'আমি কি বদল বলেছি নাকি? তোর ওপরই ছাড়লাম, যদি মনে করিস, ফালাকাটা বদলাতে হবে, তাহলে বদলে দিস্। আমি সে জন্য ওই সিম্বলটা ব্ল্যাঙ্ক এনেছি।'— 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কর্মীদের মানসিকতা বুঝে সিদ্ধান্ত নেব।' ফ্লাইট অস্বাভাবিক লেট ছিল। জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম সন্ধ্যা ৭টায়। ভীষ্মদা তাড়া দিচ্ছেন। 'চলো, তুমি ফালাকাটা ক্লিয়ার না করলে আমারও ভোটে লড়ার অসুবিধা হবে।'

ফালাকাটা যেতে সন্ধে, ইতিমধ্যে খবরের কাগজ লিখে দিয়েছে ফালাকাটা অমীমাংসিত। তবু ডি পি রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। দু'পক্ষের দাবী পাল্টা দাবী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শুনে বললাম, আমি পরিস্থিতি বুঝে গেলাম। কাল সিম্বল সোজা আলিপুরদুয়ার পাঠিয়ে দেব।

আমি চিরকাল আলিপুরদুয়ারে মন্টু (রক্ষিত)-দাকে নেতা মেনেছি। ছাত্র পরিষদ করার সময় বুক দিয়ে আগলে রাখত। ফালাকাটা হয়ে রাত দুটোয় আলিপুরদুয়ার পৌঁছে ঘুম থেকে মন্টুদাকে তুললাম। তার হাতে ব্ল্যাঙ্ক সিম্বল পেপারটা দিয়ে বললাম, 'তুমি যে নাম বসাবে, সেই প্রার্থী।'

পরের দিন সকালবেলা প্রিয়দার অফিস থেকে ডিএম-এর কাছে radiogram 'Please note that the INC candidate for 13 Falakata is ..... in place of …. । আমি রেডিওগ্রামের কপিটাকে পকেটে নিয়ে মালবাজার দিয়ে একটু ঘুরপথে আর কোথাও না গিয়ে বাগডোগরা দিয়ে সোজা দিল্লি।

বিকেলে পশ্চিমবাংলার ভারপ্রাপ্ত এআইসিসি-র সম্পাদক আর এল ভাটিয়ার কাছে হাজির হলাম। উনি মুখটা করুণ করে বললেন, 'সরি ডি পি, মুঝে মজবুরি মে ফালাকাটা ক্যান্ডিডেট বদলনে পড়া।' আমি বললাম, 'না স্যার, বদলায়নি। কারণ, তার আগেই প্রথম প্রার্থীর পক্ষে সিম্বল লেটার জমা পড়ে গিয়েছিল, আমারও কিছু করার ছিল না।' উনি বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

অরণ্য মিত্র

ডুয়ার্সকে কেন্দ্র করে গোটা নর্থ-ইস্ট সমেত নেপাল-ভুটানে একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবার তৈরি হবেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। মেগা সিরিয়ালের অন্তিম পর্বে তিনি হলদিবাড়ি-শেয়ালদা সুপার ফাস্ট থেকে নামলেন ডুয়ার্সের এক স্টেশানে। এক টোটো চালক তাঁকে নিয়ে গেল একটি বাড়িতে। সেটাই হবে এখন থেকে বুদ্ধ ব্যানার্জির দ্বিতীয় আস্তানা। নবীন রাই-এর ভাগ্য কি লেখা হয়ে গেল কালিঝোরার কাছে? কোচবিহারে কাজে যায় রাই। জেলার এক অখ্যাত জনপদের মেয়ে। রেস্টোরান্টে তাঁর সঙ্গে কে এল দেখা করতে? কাহিনির এই পর্ব সমাপ্ত, কিন্তু অন্ধকার জগতের ধারা অব্যাহত। তাই হয় তো শেষ হল কোনও এক 'শুরু'তে।

১১৮

এখন শরৎকাল, কিন্তু পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। নবীন রাই নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সময় এখন বেশ শান্ত। ক্যাভেন্ডিস গিয়েছে ব্রাজিলে। সেখানে আন্তর্জাতিক মারিজুয়ানা চক্রের একটা গোপন সম্মেলনে যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। দলের পক্ষ থেকে বোসবাবু যে হামলাটা বুদ্ধ ব্যানার্জির লোকজনের উপর চালিয়েছিল, সেটা এখন পুরনো। কিন্তু সেই হামলাটা নিয়ে ক্যাভেন্ডিসের অসন্তোষ কাটেনি। তবে বোসবাবুদের উপর পালটা হামলাটা ঠিক কারা করেছিল, তা নিয়ে নবীন রাইয়ের ধন্দ কাটেনি। পল অধিকারীর নাম এ প্রসঙ্গে বারবার আসছে। কিন্তু পলের হাতে স্নাইপার থাকলেও তেমন রাইফেল থাকা নিয়ে সন্দেহ আছে নবীন রাইয়ের মনে।

গত দু'-তিন মাস ধরে অবশ্য বুদ্ধ ব্যানার্জির ব্ল্যাক বেঙ্গল দলের কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুধু দু'সপ্তাহ আগে কামাখ্যাগুড়ি বলে একটা জায়গায় কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়া ছাড়া ডুয়ার্সেও তেমন কিছু ঘটেনি। রাজা রায় মরে যাওয়ার কারণে পল অধিকারী এখন একশো ভাগ নিশ্চিত। সে নিশ্চয়ই জাল গোটাচ্ছে।

কালিম্পং থেকে নামছিলেন নবীন রাই। কালিঝোরার কাছে এসে একটু দাঁড়ালেন। ভেজা পাহাড়ি পথে গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত হওয়ার কারণে তিনি দাঁড়ালেন না। লম্বা খাঁচার মতো লোহার সেতুটা পেরিয়ে একটা নির্দিষ্ট মাইলপোস্টের সামনে তাঁর দাঁড়াবার কথা। গাড়ি দাঁড় করাবার মতো খানিকটা বেশি জায়গা আছে এখানে। গাড়ির সামনে দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়াতে হবে নবীন রাইকে। তাহলে গগন তামাঙের লোক চিনতে পারবে তাঁকে।

গতকাল ফোনে গগন তামাঙের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নবীন রাইয়ের। যে নাম্বারে কল এসেছিল, সেটা দলের লোকের বাইরে কেউ জানে না। কিন্তু গোপাল তামাংকে নবীন রাই চিনতে পারছিলেন না। তখন সে নেপালিতে বলেছিল, 'আমি নেপালে কাজ করি। আমার কাছে কিছু গ্রেনেড আছে। পাকিস্তানি আর্মির মাল। ওদের অফিসাররা হিসেবে গণ্ডগোল দেখিয়ে গ্রেনেডগুলো বাইরে বেচে দিয়েছিল। এদিকে আপনি এসব কেনেন বলে আমরা জানি।'

'মাল দেখব আগে।' বলেছিল নবীন রাই। তখন কথা হয়েছিল, কালিঝোরায় দেখানো হবে গ্রেনেডগুলো। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ালে সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাবে কেউ।

নবীন রাই গাড়ির সামনে পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। হাওয়া বইছিল। সামনের জমি প্রথমে ঢালু, তারপর খাড়া নেমে গিয়েছে তিস্তার দিকে। নদীতে ব্যারেজ তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। নবীন রাই তার কিছু কিছু দেখতে পারছিলেন।

আরও একজন দেখছিল। তবে সে দেখছিল নবীন রাইকে। নদীর উলটো দিকে পাহাড়ের ঢালে, গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে টেলিস্কোপিক রাইফেলের ভিউফাইন্ডারে চোখ দিয়ে তাঁকে নিশানা করছিল আরেকজন। হাওয়াটা একটু ঝামেলা করছে। কখনও বেড়ে যাচ্ছে হুস করে। তখন তার স্পিড আন্দাজ পনেরো কিলোমিটার।

এই সময়টায় গুলি করলে অনেকটা সুইং করে যাবে বুলেট। অবজেক্ট প্রায় সাতশো মিটার দূরে। একেবারে গুলি খাওয়ার জন্য পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নবীন রাই ঘাড় ঘোরালেন। দুটো সুন্দরী কিশোরী হেঁটে যাচ্ছিল। নবীন রাই তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারাও হাসল। তারপরেই অবাক হয়ে দেখল যে, পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়ানো লোকটা হাসিটা পুরো শেষ করার আগেই হঠাৎ যেন ঝাঁকুনি খেল। তারপর গাড়ির বনেট ঘেঁষে পড়ে গেল মাটিতে। মাথাটা বাম্পারে আটকে যাওয়ায় তাঁর চেহারাটা হল আধশোয়া মানুষের মতো। চোখ দুটো বন্ধ। জুলপি ঘেঁষে একটা গর্ত। খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এসেছে সে গর্ত দিয়ে।

নদীর ওপারে স্নাইপারটি রাইফেলটা নামিয়ে নিল। দ্রুতহাতে সেটা কয়েকটা অংশে খুলে ফেলে ভরে ফেলল একটা ব্যাগে। তারপর ধীরেসুস্থে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে।

নিমগ্ন হয়ে থাকার দৃশ্যটা তুলে রাখছিল। নির্ঘাত কালকের পেজ থ্রি-তে বেরিয়ে যাবে সে ছবি।

১১৯

রাত ন'টা পাঁচে সুপারফাস্ট ট্রেনটি জলপাইগুড়ি স্টেশনে থামল। ট্রেন খালি করে লোক নামল স্টেশনে। ভাদ্র মাসের শেষের দিকে ডুয়ার্সের আবহাওয়া বেশ দুর্যোগপূর্ণ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, সঙ্গে হাওয়া আর মেঘের গর্জন শুনতে পারছিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। একটা ছোট সুটকেস হাতে নিয়ে লোকজনের সঙ্গে মিশে তিনি বেরিয়ে এলেন স্টেশনের বাইরে। গুচ্ছ গুচ্ছ টোটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চালকরা ডাকাডাকি করছে।

বুদ্ধ ব্যানার্জি এদিক-ওদিক তাকালেন। একজন মধ্যবয়সি টোটোচালক এগিয়ে আসছে। মাথায় গামছা পেঁচানো। ফোনে কথা হলেও অনেকদিন পর দেখছেন এই টোটোচালককে তিনি।

'নমস্কার দাদা!' টোটোচালক সুটকেসটা

> সত্যি সত্যিই ডুয়ার্সে সময় দিতে হবে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে। ব্ল্যাক বেঙ্গলের অনেক ফাঁকফোকর আছে। সব মেরামত করতে হবে। তারপর গোটা নর্থ-ইস্ট আর নেপাল-ভুটান জুড়ে বানিয়ে ফেলতে হবে তুখড় নেটওয়ার্ক। তৈরি করতে হবে একটা অন্ধকার সাম্রাজ্য, যা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নবীন রাই জেনে-বুঝে ডার্ক ক্যালকাটার বিরুদ্ধে হামলার জন্য অস্ত্র জুগিয়েছিল। বুদ্ধ ব্যানার্জির আদালতে এটা অপরাধ। তাই নবীন রাইকে এখানে ডাকিয়ে এনে খতম করে দেওয়া হল।

পনেরো মিনিট পর পল অধিকারীর কাছ থেকে ফোনে নবীন রাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নিশ্চিত গলায় বুদ্ধ ব্যানার্জি বললেন, 'তোমার এই বর্মন একটা অ্যাসেট, পল! ওর মতো স্নাইপার ইন্ডিয়ান আর্মিতেও নেই।'

'এরপর কী চাইছেন দাদা?' পল অধিকারী তৃপ্তির সুরে জানতে চাইল।

'এরপর পুজোর ছুটি।' লঘু গলায় বললেন বুদ্ধ ব্যানার্জি, 'কিছুদিন ফুর্তিতে থাকো। তারপর জানিয়ে দেব।'

ফোন রেখে দিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। এখন তিনি গঙ্গাবক্ষে ভাসমান একটা রেস্টোরান্টে বসে আছেন। পাশে একজন অনুচর। তিনি অনুচরটাকে বললেন, 'কাল ডুয়ার্সের টিকিট করো।'

'ক'টার ফ্লাইট দাদা?'

'ট্রেন। শেয়ালদা-হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট।' গঙ্গার দিকে একমনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জানালেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। দূর থেকে একজন চিত্র সাংবাদিক তাঁর সেই

নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'আসুন।'

নীরবে টোটোচালককে অনুসরণ করে তাঁর গাড়িতে উঠলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। বৃষ্টির কারণে গাড়ির চারপাশ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধ ব্যানার্জি পরদা সরিয়ে ভিতরে বসে সামনে বসা চালককে জিজ্ঞেস করলেন, 'টোটোচালক হিসেবে তোমাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু বিজু!'

'আপনি সেই যে বললেন জলপাইগুড়িতে গিয়ে টোটো চালাতে—আমিও শুরু করে দিলাম। সারাদিন ঘুরে বেড়াই। তিন-চারশো হয়। ওই দু'পেগের দাম ওঠে দাদা!' হাসতে হাসতে বলল বিজু প্রসাদ, 'দলের সবাই জানে আমি মরে গিয়েছি। বেশ এনজয় করছি দাদা!'

'দাস-বোস-ক্যাভেন্ডিসদের সামলে চলতে হবে বিজু! একটা নিজের লোক না থাকলে চলবে কীভাবে? তবে টোটো বেশি দিন চালাতে হবে না। ক্যাভেন্ডিসকে নজরে রাখার দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে।'

'হয়ে যাবে দাদা।'

'এদিকের খবর কী?'

'কনক দত্ত মাঝে মাঝেই পরি ঘোষালের বাড়ি আসে। খতম করে দেওয়াটা কোনও চাপই না।'

কেরালা টুর ২০১৭

জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭
(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)
১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)
৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)

টুর প্যাকেজে থাকছে
১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) **(ট্রেনের খাবার বাদে)**

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

‘দরকার নেই বিজু। কনক দত্ত থাকুক। কন্যাসাথির কেসটা সে দারুণ ধরেছিল। শ্যামল ছেলেটা যদি পুলিশে ফোন করে মেয়ের চিৎকার শোনার ব্যাপারটা বলে দিত, তাহলে ঝামেলা ছিল। আর শ্যামলকে তোলার দায়িত্ব যার উপর ছিল, সে মোবাইল রিচার্জ করে আরেকটা ভুল করেছিল। আমাদের জগতে এত ভুল করা যায় না বিজু। তবে দত্তকে নজরে রাখতে হবে। শুক্লা দাসকে সে প্রায় ধরেই ফেলেছিল।’

প্রায় মিনিট কুড়ি চলার পর টোটো গাড়িটা একটা গলিপথ ধরল। দু’পাশে সার সার বাড়ি। শহর লাগোয়া এ গলিতে একদা সুভাষ ঘিসিং নির্বাসিত জীবন কাটাতেন। একটা ছোট দোতলা বাড়ির সামনে এসে টোটো থামল।

‘এই বাড়িটা কিনেছি দাদা। তবে আমি থাকি কেয়ারটেকার হয়ে।’ বিজু প্রসাদ হাসল।

বুদ্ধ ব্যানার্জি গাড়ি থেকে নামলেন। বাড়িটা ছিমছাম দেখতে। পাড়াটা চুপচাপ শান্ত। পাড়ার লোক জানবে, বাড়িটা তিনি মালিকের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছেন। তিনি একজন ভ্রমণ লেখক। ডুয়ার্স এবং পাহাড়ের ভ্রমণ কাহিনি লেখার জন্য আগামী কয়েক মাস ডুয়ার্সে ঘুরবেন। থাকার জন্য তাই বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন।

সত্যি সত্যিই ডুয়ার্সে সময় দিতে হবে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে। ব্ল্যাক বেঙ্গলের অনেক ফাঁকফোকর আছে। সব মেরামত করতে হবে। তারপর গোটা নর্থ-ইস্ট আর নেপাল-ভুটান জুড়ে বানিয়ে ফেলতে হবে তুখড় নেটওয়ার্ক। তৈরি করতে হবে একটা অন্ধকার সাম্রাজ্য, যা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধ ব্যানার্জি বাড়িটার দিকে পা বাড়ালেন। একটু হাত বুলিয়ে নিলেন মাথায়। আসলে তিনি একটা পরচুলো পরে আছেন। তাই একটু একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু পরচুলাটা তাঁকে অনেকটাই পালটে দিয়েছে। এবার কাল সকাল থেকে ধুতির বদলে প্যান্ট পরবেন তিনি।

কাছে কোথাও তুমুল শব্দে একটা বাজ পড়ল।

উপসংহার

কোচবিহার থেকে বাসে মাথাভাঙায় আসতে ঘণ্টাখানেক। তারপর সেখান থেকে নিজের গ্রামের বাস স্টপ মিনিট চল্লিশের পথ। সব মিলিয়ে বাড়ি ফিরতে দু’ঘণ্টা। এখন দুপুর আড়াইটে। সুতরাং হাতে খানিকটা সময় আছে। রাই একটা টোটো ডাকল। এখন সে মাসে দশ-বারো দিন খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোচবিহার, দিনহাটা, আলিপুরদুয়ারে আসে। দিনে দেড়-দু’হাজার টাকা রোজগার হয়। এ ছাড়া খদ্দের খুশি হয়ে বাড়তি কিছু দেয় বলে মাসে চব্বিশ-পঁচিশ হাজার আয় করে রাই। গত এক বছর ধরে এমনই চলছে। গোটা টাকাটাই উড়িয়ে দেয় সে। এ জন্য কলেজে, বন্ধুমহলে তার বেশ জনপ্রিয়তা।

কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকা যে বিলাসব্যসনের জন্য মোটেই তেমন কিছু নয়, সেটা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে রাই। সে মাঝারি ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে। তার ভাই পড়াশোনায় ভালো। তার জন্য বড় খরচ অপেক্ষা করে আছে। রাই পড়াশোনায় খুব একটা আগ্রহ পায় না। সে মাঝারি ছাত্রী। গত বছর কলেজে ভরতি হয়েছিল পাস কোর্সে। কলেজে প্রথম দিনই তার প্রেমে পড়ে যায় স্থানীয় প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তির ছেলে। সমবয়সি সেই ছেলেই ছিল রাইয়ের প্রথম বয়ফ্রেন্ড। তার নাম পরাগ।

‘কাস্টমার’ শব্দটা এক ধাক্কায় সোজা করে দিয়েছিল রাইকে। পরের সপ্তাহে আর কোনও অসুবিধে হয়নি। তারপর গত এক বছরে আরও আরও কাস্টমার সামলে এসেছে রাই। কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

পরাগ আসলে ঠিক প্রেমে পড়েনি। সে ধরনের ছেলেই ছিল না সে। পরিচয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই সে রাইয়ের শরীরের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে শুরু করে। একদিন নির্জন, অন্ধকার রাস্তায় পরাগ যখন তার শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে হাঁটছে, রাই তখন জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুই কি এসব করার জন্যই ভালবাসিস আমাকে?’

‘কাল কী হবে, কেউ জানে?’ শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিল পরাগ, ‘তবে আমাকে এনজয় করার স্কোপ না দিলে খরচা করে কী লাভ বল? তোকে তো আমি বিয়ে করব না।’

‘খরচা?’ কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে জিজ্ঞেস করেছিল রাই।

‘তোকে গিফ্‌ট দিচ্ছি। খাওয়াচ্ছি। ঘোরাচ্ছি— খরচ নেই?’

‘ফুল এনজয় করতে দিলে কত দিবি?’

রাইয়ের প্রশ্নে একটু চুপ করে থেকে পরাগ বলেছিল, ‘আমি তো বাপের পয়সায় ফুটানি করি। এই আংটিটা গিফ্‌ট করে দেব তোকে।’

ডান হাতের চারটে আংটির সব চাইতে ভালটা দেখিয়েছিল পরাগ। এরপর তিন মাস উদ্দাম শরীরী প্রেমে কেটেছিল দু’জনের। পরাগ আরও কিছু দিয়েছিল। দামি মোবাইল। সাড়ে তিন হাজারের কুর্তি। আরও টুকিটাকি। তিন মাস পর একদিন কোচবিহারের একটা হোটেলের ঘরে কন্ডোম খুলতে খুলতে বলেছিল, ‘বয়ফ্রেন্ড পালটাবি রাই?’

চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা রাই শরীরের উপর আবরণ টেনে দিতে দিতে জবাব দিয়েছিল, ‘সিরিয়াসলি বলছিস?’

‘সিনিয়র বয়ফ্রেন্ড দিতে পারি তোকে। মাসে তিন-চার দিন কোচবিহারে গিয়ে প্রেম করে আসবি। অফিসের পিছনেই এসি ঘর আছে।’

‘তুই কী করবি?’

‘সোমদীপা রাজি হয়েছে। তুই এখন এক্সপিরিয়েন্সড। তোকে অনেক গিফ্‌ট দিতে হয়।’

‘ওকে।’ বিছানা থেকে উঠে বলেছিল রাই, ‘নতুন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিস।’

‘ফোন নম্বর রাখ। সব বলা আছে। ঠিকমতো প্রেম করবি। মাসে পনেরো হাজার ক্যাশ।’

সেই দ্বিতীয় বয়ফ্রেন্ড ছিল মাঝবয়সি এক উদ্যোগী অসমিয়া। কোচবিহারে ঝাঁ-চকচকে ছোট অফিস। দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাটের একটায় অফিস এবং দ্বিতীয়টা বয়ফ্রেন্ড মালিকের লীলাক্ষেত্র। রাই আসত সকাল ন’টার মধ্যে। প্রথম দিন দুপুর দেড়টা নাগাদ ছাড়া পাওয়ার পর অতি সুসজ্জিত আধুনিক বাথরুমে ঢুকে রাই প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর আসবে না। পরাগের সঙ্গে বিছানায় যা হত, সেখানে সামান্য হলেও ভালবাসা ছিল। কিন্তু নতুন বয়ফ্রেন্ড কিছুক্ষণ প্রেমিকের মতো নরম ছিল। কিন্তু সে মুখোশটা খুলে গিয়ে যেটা বেরিয়ে এল, সেটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল রাইয়ের ধারণা।

তারপর ফ্রেশ হয়ে সে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন অসমিয়া বয়ফ্রেন্ড হাসিখুশি মুডে সিগারেট টানছিলেন। রাইয়ের হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘প্রথম মাসের গোটাটাই অ্যাডভান্স দিলাম। স্টিফনেসটা কাটাতে হবে। আমি কিন্তু তোমার কাস্টমার।’

‘কাস্টমার’ শব্দটা এক ধাক্কায় সোজা করে দিয়েছিল রাইকে। পরের সপ্তাহে আর কোনও অসুবিধে হয়নি। তারপর গত এক বছরে আরও আরও কাস্টমার সামলে এসেছে রাই। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। এখন সে কোনও বাঁধা খদ্দের রাখে না। স্বাধীনভাবে কাজ করার আলাদা মজা আছে। তার কাস্টমারদের অধিকাংশই ভদ্রলোক। চমৎকার বাড়িতে থাকে। নগদ বেশি দিতে না পারলেও সিকিয়োরিটি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না বলে রাই এই পরিধিতেই ঘোরাফেরা করছে। সে বাড়ি থেকে বার হয় ‘কলেজ

যাচ্ছি’ বলে। সন্ধের আগেই তাকে বাড়িতে ফিরে আসতে হবে। কাস্টমাররাই নতুন খদ্দের এনে দেয় তাকে।

আজকের কাস্টমারটি কলেজে পড়ান। আজই তাঁর সঙ্গে প্রথম দিন ছিল রাইয়ের। পুজো আর কয়েকদিন। কলেজ শিক্ষকটি বিবাহিত। বউয়ের সঙ্গে দূরত্ব চলছে। খানিকক্ষণ দুঃখের কাহিনি বলার পর তার দিকে ছলছলে চোখে তাকাতে রাই আর দেরি করেনি। কাস্টমারের গলা জড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে বলেছিল, ‘আমাকেই বউ ভাবুন।’

কাস্টমার এরপর সম্মোহিত হয়ে পড়েন। তাই কাজ শেষ করে তাঁর কাছ থেকে প্রায় দ্বিগুণ টাকা আদায় করে বেরিয়েছিল রাই। পুজোর মাসে খারাপ এল না। কিন্তু নতুন হওয়া এই জুয়েলারির দোকানটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে রাইয়ের মনে হয় যে আরও দরকার। আরও।

আসন্ন পুজোর কারণে রাস্তা গমগম করছে। গরম প্রায় নেই বললেই চলে। হালকা মেঘের আড়ালে সূর্য আবছা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাওয়া বইছে। রাই একটা ছোট রেস্টোরান্টের সামনে দাঁড়াল। কিছু খেতে ইচ্ছে হল। একা একা রেস্টোরান্টে খেয়ে কোনও মজা নেই। কিন্তু কোচবিহারে তাকে কে চেনে?

রেস্টোরান্টে ঢোকার সময় প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে আরেকটা মেয়ে ঢুকল। কালো প্যান্ট আর গোলাপি টপ পরা মেয়েটির গায়ের রং চাপা হলেও চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল। সে রাইয়ের দিকে তাকিয়ে চমৎকার হেসে বলল, ‘একা?’

‘হ্যাঁ।’

‘একসঙ্গে বসতে পারি?’

‘শিয়োর!’

দু’জনে মুখোমুখি ছোট টেবিলে বসল। অজানা মেয়েটি রাইয়ের চেহারাটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কাজ সেরে এলে?’

‘হ্যাঁ, মানে—।’ রাই একটু থতমত খেয়ে বলল, ‘অ্যাকচুয়ালি আমি—।’

‘থাক। আমি জানি, তুমি কী করো।’

‘কী করি আমি?’ রাইয়ের গলা একটু কেঁপে গিয়েছিল। অজানা মেয়েটি সেটা বুঝতে পেরে হেসে বলল, ‘ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি তোমার ওয়েল উইশার। আসলে তুমি চাইলে আরও বেশি রোজগার করতে পারো। কমপক্ষে মাসে ফিফটি থাউজ্যান্ড। দুটো নান, বাটার-পনির দিয়ে।’

শেষ বাক্যটা ওয়েটারের উদ্দেশে।

রাই কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকল। আসলে সে দ্বন্দ্বে ভুগছিল। অজানা মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায় কি না, তা নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল তার মনে।

‘তুমি চাইলে আমি এ নিয়ে কথা বলব না রাই।’

‘আমার নাম কী করে জানলেন?’

‘তোমার নাম রাই। ভালনাম রূপলাগি রায়। মাথাভাঙা থেকে সিতাই রুটের বাসে তোমার বাড়ি যেতে লাগে এক ঘণ্টার কম। তোমার একটাই প্রবলেম। সন্ধের আগে বাড়ি ফেরা। পরের প্রবলেমটা কী হবে জানো?’

রাই বেশ অবাক গলায় বলল, ‘কী হবে?’

‘কলেজ শেষ হয়ে গেলে তুমি বাড়ি থেকে বার হবে কী বলে? আর তো এক বছর।’

‘আমি জানি না।’ বলল রাই।

অজানা মেয়েটি নিঃশব্দে হাসল— ‘তখন মাসে তিন-চার দিন ম্যানেজ করলেই এনাফ। এর জন্য তোমার চাই হাই প্রোফাইল কাস্টমার অ্যান্ড ইউ নিড কিছু ট্রেনিং।’

‘ট্রেনিং?’

‘বাইবেল বলেছে, প্রেম কী আর সেটা কীভাবে করতে হয় তা শিখিয়েছে কামসূত্র।’ একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে কথাটা শেষ করল মেয়েটি। তারপর সোজা হয়ে বসে রাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘বলব? নাকি সাবজেক্ট চেঞ্জ করব?’

‘ওকে।’ রাই এতক্ষণে একটু হাসল— ‘আপনি কে?’

‘ওয়েল।’ মেয়েটির চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হল এবার। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘আমি সুষমা।’

বাইরে চমৎকার শারদ অপরাহ্ণ। কর্মব্যস্ত লোকজন টের পাচ্ছিল না যে, একটা বজ্রগর্ভ মেঘ আসছে। হাওয়াটাই টেনে আনছে সেই মেঘকে। হয়ত কিছু হবে। হয়ত হবে না। গভীর কালো মেঘটা সবে আলিপুরদুয়ারকে ঢেকেছে। হয়ত ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তুমুল শব্দে ভেঙে পড়বে কোচবিহারে। হয়ত দিক বদলে ভাসিয়ে দিতে পারে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি কিংবা বারোবিসা, সংকোশ। আবার না-ও পারে। কিন্তু মেঘটা ভাঙুক বা না ভাঙুক, ডুয়ার্সে প্রতিক্ষণে বিন্দু বিন্দু করে জমছে অদৃশ্য মেঘ। অতি ধীর ক্ষয়ের বাষ্প জমে নির্মিত হচ্ছে সে মেঘের কণা।

হঠাৎ দেখা যাবে, সে মেঘে ঢেকে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে সবুজ ডুয়ার্স। ক্যামেরার জন্য এতটুকুও আলো নেই আর।

সমাপ্ত

এই মেগাসিরিয়ালের দ্বিতীয় ভাগ ‘সবুজ ঘাস নীল ছবি’ নামে ভবিষ্যতে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

‘এখন ডুয়ার্স’-এর আগামী ১৬ অক্টোবর সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে সাগরিকা রায়ের নতুন ধারাবাহিক ক্রাইম থ্রিলার

‘শাল বনে রক্তের দাগ’

পাহাড়, নদী, জঙ্গল সমন্বিত ডুয়ার্সের গহীনে রয়েছে ভয়াল এক জগৎ। যে জগতের পাঁকে পাঁকে ময়ালের দূষিত নিঃশ্বাসের মতো জড়িয়ে আছে অপরাধ। একটি হত্যার পথ ধরে আসে হিমশীতল পদক্ষেপ! শালবনে রক্তের দাগ— সেই মৃত্যুর পিচ্ছিল নিশানায় আনে একের পর এক রূদ্ধশ্বাস ঘটনা।

এখন ডুয়ার্স

উত্তরঙ্গ তরঙ্গ

৫৫

তিস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে যেদিকেই তাকাও না কেন— আকাশ জুড়ে কেবল ঘন মেঘ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝিরিয়ে। হাওয়ার জোর খারাপ নয়। আশ্বিন মাসের এই আবহাওয়া এক ধাক্কায় শীতের আমেজ এনে দিয়েছে টাউনে। একটু বয়স্করা চাদর গায়ে বার হচ্ছে পথে। তিস্তার পাড়ে হাওয়ার দাপটটা বেশি বলে মাঝে মাঝে কাঁপুনি লেগে যাচ্ছিল গগনেন্দ্রর। গনি ইসলামের অবশ্য ঠান্ডা লাগছিল না। সে একটু আগেই একটা পান খেয়েছে গুয়া সুপুরি দিয়ে।

'জল তো ভালই বাড়সে দাদা।' গনি জানাল, 'কাইল নামবে বলে মনে হয় না। আকাশ কাইলও এমন থাকবে।'

'তাহলে গোপাল ঘোষের বজরাটাই নিয়ে নিই, কী বলো?'

'কয়া রাখেন উনারে। বাইরোবেন তো কাইল সন্দার আগে। সকালে আইনা ঘাটে লাগায় দিব।' গনি পানের রস গিলে জানায়। আরেকটু হলে সে রস পড়ে যাচ্ছিল তাঁর কষ বেয়ে। গনি ইসলাম পাকা মাঝি। বজরা নিয়ে গেলে সে-ই হাল ধরবে। পাহাড়ে বৃষ্টির কারণে তিস্তায় প্রায় পুরোটাই ভরে আছে এখন। স্রোতের তেজ ভালই। এই অবস্থায় উজানে বজরা নিয়ে যেতে যেমন দাঁড়ের জোর লাগবে, তেমনই লাগবে অভিজ্ঞ হালধারী।

'আপনেরা ঠিক যাবেন কোথায় কন তো।' গনি ইসলাম কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করে এবার। গগনেন্দ্র এখন গন্তব্যটা ভালভাবে জানে। কোজাগরীর রাতে নৌকোয় বসে তারিণী বসুনিয়ার কাছ থেকে শুনেছে। তিনিও যাবেন গগনেন্দ্র আর বীরেনের সঙ্গে উপেনের কাছে। দু'-চারটে অস্ত্র নিয়ে যাবেন সঙ্গে। সেসব অবশ্য লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বীরেন কেবল প্রকাশ্যে হাতে একখানা রাইফেল রাখবে। সেটা শিকার করার জন্য। সঙ্গে থাকা মাঝিমাল্লাদের তো বোঝাতে হবে যে, তারা শিকারে যাচ্ছে।

'দোমোহানি ঘাটের পর উজানের দিকে খানিকটা গেলে দেখবে, একটা নদী এসে তিস্তায় মিশেছে।'

'সেখানে শিকার পাইবেন?'

'না না।' গগনেন্দ্র বোঝাতে থাকে, 'আমরা সে নদীতে ঢুকব। তারপর কিছুটা যেতে হবে।'

গনি ইসলাম চিন্তায় পড়ে যায়। সে নদী বেয়ে সে কখনও যায়নি। শুনেছে যে, নদীটা ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এসে মিশেছে তিস্তায়। অবশ্য কর্তাদের সঙ্গে বন্দুক থাকবে। কিন্তু অজানা নদীপথে রাতের

বেলায় জিন-টিন বার হলে কী করবে গনি ইসলাম? রাতের বেলায় তিস্তার যত উজানে যাওয়া যায়, ততই সমস্যা। কত কী যে ঘুরে বেড়ায় নদীতে! সেসবের ব্যাখ্যা হয় না। সে জলপাইগুড়ি থেকে নৌকো নিয়ে গাজলডোবা চা-বাগান পর্যন্ত গিয়েছে। তারপর আর যাওয়া যায় না। বাবুর সেদিকে গেলে অতটা ভাবনার ছিল না। সে নদী তো গনি ইসলাম চেনে! কিন্তু বাবুটি যে পথের কথা বলল, সেটা খুবই চিন্তার পথ।

'সেদিকে কি শিকার মিলবে বাবু?' গনি ইসলাম কিন্তু কিন্তু মুখে জানায়, 'ধরেন, নৌকা থেকে ডাঙায় ওঠার রাস্তাই পেলেন না! দিনেমানে বেরয় গেলে অবশ্যি আলাদা। কিন্তু আপনেরা তো সন্দার দিকে রওয়ানা দিতে চান।'

গগনেন্দ্র একটু হাসল। তারপর বলল, 'বজরার খবর জানতে দুপুরের দিকে এসো। আমি কথা বলে নিচ্ছি।'

কুয়াশার মতো বৃষ্টিতে গগনেন্দ্রর মাথা ভিজে যাচ্ছিল। রুমাল বার করে মাথা মুছে সে এগিয়ে গেল গাড়ি ধরার জন্য। পুজোর পর এমন আবহাওয়ায় খুব একটা কাজ না থাকলে লোকজন বার হচ্ছে না। ঘাটে নৌকোর আনাগোনা খুবই কম। বেশির ভাগ নৌকোই বেঁধে রাখা। এক কোনায় চাঁদোয়া খাটিয়ে হিন্দুস্তানি মাঝিরা রুটি বানাচ্ছে। বার্নিশের দিক থেকে হঠাৎ একটা নৌকো কিছু যাত্রী নিয়ে এলে একটু হইচই শোনা যাওয়া ছাড়া কিং সাহেবের ঘাটে শুধু তিস্তার জলে একটানা ছলছল শব্দ। এর মধ্যেই একটা যাত্রার দল চুড়াভাণ্ডার গ্রামে যাবে বলে কয়েকটা গোরুর গাড়িতে মাল বোঝাই করে থামল ঘাটের কাছে।

গগনেন্দ্রর একটা কাজ আছে এখন। রাইফেলের জন্য টোটা কিনতে হবে। বীরেন রাইফেলটা জোগাড় করেছে সাহেবপাড়ার স্যামুয়েল সাহেবের কাছ থেকে। বুড়ো এখন লাঠি নিয়ে হাঁটেন। এককালে নামী শিকারি ছিলেন। এখন বিকেল হলেই ইউরোপিয়ান ক্লাবে বসে হুইস্কি খান আর শিকারের গল্প শোনান। বিলেতে বুড়োর কেউ নেই বলে আর ফিরে যাননি। দার্জিলিঙে বাড়ি আছে। গরমটা তিনি সেখানেই কাটান। রাইফেল দিতে অবশ্য গোড়াতে তিনি রাজি ছিলেন না। বীরেনকে তিনি ভালই চেনেন। বড়দিনে নেমন্তন্ন করেন। কিন্তু শিকারে যাওয়ার জন্য তাঁকে রাইফেল দিতে হবে জেনে খুব অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'সে তো দিনবাজারে ভাড়াই পাওয়া যায় খোকা! মনে তো হয় না, তোমার ভাড়া করার জন্য পয়সার অভাব আছে। বরং চাইলে কিনেই ফেলতে পারো।'

'ভাড়া করলে বাবা জেনে যাবে।' বীরেন বুঝিয়েছিল, 'বাবা শিকার-টিকার পছন্দ করে না?'

'তা-ই?' স্যামুয়েল বুড়ো যেন সমস্যাটা বুঝলেন— 'কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলে তো আমি বলে দেব তাঁকে।'

'সেটা নিশ্চয়ই এর মধ্যে হচ্ছে না।'

'নো নো। নট বিফোর ডিয়ালি সেলিব্রেশন। ডু ইউ নো দ্যাট আই হায়ার আ জেনারেটর অন দ্যাট ডে?'

'সে কে না জানে।' বলেছিল বীরেন। স্যামুয়েল সাহেব যে জেনারেটরে রকমারি আলো জ্বালিয়ে দেওয়ালি পালন করেন, সেটা টাউনে সর্ববিদিত। দেখার জন্য ভিড় কম হয় না।

'কিন্তু তোমাকে বাঘে খতম করে দিলে আমার রাইফেলের কী হবে খোকা?' জানতে চেয়েছিলেন স্যামুয়েল সাহেব, 'তোমার থেকে আমি ভাড়া নিতে পারি না। কিন্তু জমানত কিছু তো আশা করতেই পারি।'

স্যামুয়েল সাহেবকে বীরেন বিলক্ষণ চিনত বলে তৈরি হয়েই এসেছিল। পকেট থেকে ছোট্ট একটা থলে বার করে সাহেবের সামনে রেখে দিয়ে বলল, 'এতে চারটে গিনি আছে।'

'খুব ভাল। এটা যথেষ্ট। তবে শিকারে বেশি ঝুঁকি নিয়ো না। তুমি অক্ষত দেহে ফিরে এলে আমার ভাল লাগবে। গিনিগুলো বাজেয়াপ্ত করতে সেটা লাগবে না।'

অতঃপর রাইফেল পেয়েছে বীরেন। সেটা রাখা আছে গগনেন্দ্রর দিদির বাড়িতে। আগামীকাল শিকার করতে যাওয়ার ব্যাপারটা বাড়ির লোকেরা সবাই জানে এখন। সবাই ধরে নিয়েছে যে এটা আসলে বয়সের আনন্দ। নৌকো নিয়ে একটু ফুর্তিটুর্তি করবে বন্ধুরা মিলে। শিকারটা অজুহাত। সঙ্গে পাখি মারার বন্দুক আর ছর্‌রা থাকবে। রাতের বেলা পাখি কীভাবে মারা হবে, সে নিয়ে অবশ্য কেউ প্রশ্ন তোলেনি। রাইফেল নিয়ে শিকারের অনুমতি বীরেনের বাবা দিতেন না মোটেই। গগনেন্দ্রকেও বাধা দেওয়া হত। তবে, রাইফেল কী কাজে লাগবে তা নিয়েও বীরেন বা গগন নিশ্চিত নয়। শিকারে তো তারা যাচ্ছেই না। উপেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য রাইফেল নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। কিন্তু সেটা নিতে হবে, কারণ মাঝিরা নইলে বিশ্বাস করবে কীভাবে? তারা বাঘ শিকার আর পাখি মারার বন্দুকের তফাত দেখে বলতে পারে।

রাহুতদের বন্দুকের দোকানের সামনে এসে গগনেন্দ্র একটু থমকে গেল। নিতাইবাবু দাঁড়িয়ে। দোকানে অবশ্য খরিদ্দার বলতে কেউ নেই। তার সামনে রাস্তার উপর ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে নিতাইবাবু।

'আপনাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লাম!' নিতাইবাবু জানালেন, 'সে দিন মিটিং-এর পর তো আর দেখা হল না। তা আপনি কবে যাবেন ঠিক করলেন?'

'কোথায়?' একটু থমকে গিয়ে জানতে চাইল গগনেন্দ্র।

'কেন? বোলপুর?' নিতাই হেসে বললেন, 'গোপালবাবু তো আপনাকেই দায়িত্ব দিলেন। সভারও তো সেইটাই মত। আপনি ক'দিন থেকে যদি রবিবাবুর গতিবিধি বিষয়ে জানতে পারেন, তবে ডেটটা ফাইনাল করতে সুবিধে হয়।'

গগনেন্দ্র স্বস্তি পেল। তাদের অভিযানের উদ্দেশ্য নিতাইবাবুর জানার কথা নয়। সে হঠাৎ অমূলক ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

'এর মধ্যেই যাব, বুঝলেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' জানাল সে।

নিতাইবাবু একগাল হেসে বললেন, 'বললেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।'

কথাটা শুনে গগনেন্দ্র হেসে দোকানে ঢুকতে চাইছিল। কিন্তু এবার তাকে বিলকুল অবাক করে দিয়ে নিতাইবাবু বললেন, 'কাল শিকারে যাচ্ছেন শুনলাম!'

'কে বলল?'

'মিটিং-এর দিন একখানা বই নিয়েছিলাম আপনার শ্বশুরের কাছ থেকে। তিনিই পড়তে দিলেন। বললেন, ইংরেজি যখন পড়তে পারো, তখন এই বইখানা পড়ো। দেখো, নাটক করা যায় কি না। তা সে বই ফেরত দিতে কাল গিয়েছিলাম আপনার শ্বশুরবাড়ি। সেখানেই শুনলাম। তা বইখানা অবশ্যি সাংঘাতিক লাগল। নাটক করা বেশ কঠিন। কলকাতা ছাড়া হবে না। তবে খাসা গপ্প মশাই! পড়েছেন কি?'

'কী বই?'

'হাউন্ড অব বাস্কারভিল।'

গগনেন্দ্রর মানসপটে চকিতে একটা ছবি ভেসে উঠল। তখনও বিয়ে হয়নি। শ্বশুরের লাইব্রেরিতে শার্লক হোমসের গল্পের পাতা ওলটাচ্ছে সে। কিন্তু মন ঠিক বইয়ের পাতায় নেই। পাশের ঘরে একজনের উপস্থিতি বারবার আনমনা করে দিচ্ছে তাকে। আর্থার কোনান ডয়েলের বদলে তার মনে পড়ছে মাথাভাঙায় নিজের লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রাখা সেইসব কাহিনি, যেখানে নায়ক উদ্ধার করত নায়িকাকে। পাশের ঘর থেকে শোভাকে তুলে নিয়ে সে পালিয়ে যেত মনে মনে।

হায়! সে কী রোমাঞ্চকর দিনগুলি! অনেকদিন বইয়ের পাতা ওলটায় না সে।

'যাই। কিছু টোটা কিনতে হবে।'

দোকানে ঢুকে পড়ল গগনেন্দ্র। আজ সকালে বাবার চিঠি এসেছে। এবার যেন সে মাথাভাঙায় ফিরে আসে। ভুটানে মাল পাঠানোর বড় একটা কনট্রাক্ট পাওয়া গিয়েছে। শীত পড়ার আগে মাল পাঠিয়ে লোকজন ফিরিয়ে আনতে হবে। হাতে সময় বেশি নেই।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

যখন চ্যানেল নাক গলালেন...

আফ্রিকায় নেকড়ে থাকে কি না, সেটা ব্যাপার নয়। ব্যাপার হল, চ্যানেলদাদা পেলেকে বলেছেন লিখতে। যাচ্চলে! পেলে কেন? কেনই বা অন্ধকারের উজ্জ্বল নক্ষত্র হারিয়ে যাচ্ছে না আঁধারে? বতুকের কেয়ারটেকার বলতে কী বোঝায়? তিনিই বা কেন চেবাচ্ছিলেন মুরগির ঠ্যাং? কে শুনিয়েছিলেন লেখককে সেই মহাবাক্য— যা লেখায়, তা কি দেখায়? এমন অতি রহস্যময় কতকগুলি প্রশ্নের জবাব এবারের পর্ব না পড়লে আর কোথাও মিলবে না। হরেক মশলা মিশিয়ে রান্না করা এই ধারাবাহিক খাদ্যের এবার আরেকটি ডিশ। পুজোয় জমিয়ে খান।

লোকটাকে এক ঝলক দেখেই কেন যেন সন্দেহ হয়েছিল। তখন লাঞ্চ ব্রেক চলছে। আর সন্দেহভাজন সেই ব্যক্তি টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে হুপুস হুপুস করে মাংস-ভাত সাঁটাতে ব্যস্ত! দূর থেকে তাকে দেখে রীতিমতো মুখ অচেনা লাগল বলেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অতঃপর স্মৃতির ভিতরটা ছানবিন করে দেখে, আমার ব্রেনটাই মূল সন্দেহে জোর সায় জানিয়ে বলল, উঁহু, সারা সকালে একবারের জন্যেও একে ফ্লোরে দেখা যায়নি।

যদিও বাইরের উটকো লোক শুটিং পার্টির মধ্যে লাঞ্চ খেয়ে যাবে, সেটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তবু ইচ্ছে হল, একটু তদন্ত করে দেখি। গুটিগুটি পায়ে তাই তার সামনে গিয়ে শুধালাম, ভাই, তুমি কোন ডিপার্টমেন্ট?

আধবোজা চোখের ফাঁক দিয়ে সে আমায় আপাদমস্তক একপ্রস্থ মেপে নিল গম্ভীরভাবে। অর্থাৎ, প্রশ্নটা পছন্দ হয়নি। তবে, হাতে ধরা মুরগির ঠ্যাংখানা যে খুব পছন্দ হয়েছে, সেটা বোঝা গেল। কারণ কোনও উত্তর দেওয়ার আগে ভাল করে সেটা একবার চুষে নিল সে। যা দেখে, আমার পাপী মন বলল, ব্যাটা বুঝেছে যে, এবার ধরা পড়ে ঘাড়ধাক্কা খেতে হবে। তাই যতটা পারে মুফতের চিকেন সাঁটিয়ে নিচ্ছে। আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী এরপর লোকটা নিরুত্তর থাকার কথা। কিন্তু রইল না। সাফসুতরো মুরগির হাড়খানা ঠকাং করে থালায় ঠুকে বলল, কেন স্যার? আমি তো বন্দুকের কেয়ারটেকার! জবাব শুনে আর কিছু বলার নেই আমার! ঢোক গিলে ভাবলাম, আরিব্বাস! বন্দুকেরও কেয়ারটেকার হয়?

নিরীহ পাঠক কিংবা পাঠিকা, নিশ্চয় ভাবছেন কেয়ারটেকার কী? এবং কেয়ারটেকার কেন? আগে চলুন, এই দু'টি প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা যাক। ফিলিম জগতের ডিকশনারি বাদ দিন। আমার নিজস্ব সৃষ্ট সংজ্ঞার কথা বলি। গন্ডার কিংবা বাইসনজাতীয় জন্তুরা যখন জাতীয় উদ্যানে টহল মেরে বেড়ায়, খেয়াল করে দেখবেন, হামেশাই তাদের কাঁধে-পিঠে গুচ্ছখানেক পাখি বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে। কাজের মধ্যে যাদের কাজ হল, জন্তুর দেহের অবাঞ্ছিত পোকামাকড় ভোজন। সিরিয়াল ও সিনেমার ক্ষেত্রে শুটিং এবং পোস্ট প্রোডাকশন, দু'জায়গাতেই যেসব ছোটবড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়, সেগুলোকে ওই গন্ডার কিংবা বাইসন বলে কল্পনা করে নিন। ক্যামেরা থেকে শুরু করে লাইট, জেনারেটর,

এডিটিং-এর মেশিনপত্র বা ফাইট সিকোয়েন্সের বন্দুক (কাঠের ফল্‌স গান হোক বা আসল লোহার যন্তর)... এগুলো সবই এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। কারণ এদের সবার পিঠেই চেপে থাকে কয়েকজন করে অতিরিক্ত কর্মী, যারা যন্তরগুলোকে তাদের নির্দিষ্ট কাজে একবার জুতে দিতে পারলেই মোটামুটি সারাদিনের জন্য খালাস। একেবারে দিনের শেষে প্যাক আপ-এর পর সেগুলো গুছিয়ে তুলে নিলেই হল। তো, ইউনিটের বাকি লোকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ঘাম ঝরিয়েও পূর্ণ মর্যাদার টেকনিশিয়ান রূপে গণ্য এই ব্যক্তিরাই হলেন কেয়ারটেকার।

সকাল থেকে একটানা হাতাহাতি, মারপিটের শুটিং চলছিল। ডাক পড়েনি বলে বন্দুক এবং বন্দুকের কেয়ারটেকার কেউই ফ্লোরে নল বা মুখ দেখায়নি। যে কারণে আমার লোকটাকে চিনতে গিয়ে কনফিউশনটা হয়েছিল।

এতক্ষণ এন্তার ঘাম ঝরিয়ে এসে ফাইট মাস্টার জুডো রামু আর তার দলবল আরেক কোণে বসে লাঞ্চ সারছে। দক্ষিণী রীতিতে এদের জন্য নিরামিষ লাঞ্চের ব্যবস্থা। আমি এবার সেদিকে গেলাম। জুডোজির সাথে চোখাচোখি হতে বললাম, কেয়া জুডোজি, বন্দুক কা শট আজ হোগা না? অব হি তো আধা দিন গুজর চুকা?

জুডোজি অসহায়ের মতো মাথা নেড়ে বলল, কেয়া করে? ইয়ে সোমক তো কোই বাত হি নহি সুন রহা মেরা! ইতনা শট লে রহা... ইতনা শট লে রহা... সিন খতম হি নহি হো রহা...

জুডো রামু বরাবরই সময়ের মধ্যে শিডিউল কমপ্লিট করার জন্য প্রসিদ্ধ। বাংলা বাণিজ্যিক সিনেমার খুব দুঃসময়ের কালে চেন্নাই থেকে ক্যামেরা, অ্যাকশন এবং মিউজিক বিভাগের জন্য কিছু কিছু কলাকুশলী আমদানি আরম্ভ হয়েছিল। সাতের দশকে উত্তম-সুচিত্রা যুগের অবসানের পর বাংলা ছবি যে নিম্নগামী ডাইভ মেরেছিল, সেখানে মাঝে কিছুদিন অঞ্জন চৌধুরীর চোখা সংলাপভিত্তিক ছবিগুলো কিছুটা সামাল দেওয়ার কাজ করে। মানে, তলিয়ে যেতে যেতেও গোঁত্তা মেরে দুটো-একটা ছবি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু আটের দশকে ক্রমাগত ডায়ালগ আর সেন্টিমেন্ট-নির্ভর হতে গিয়ে সিনেমার টেকনিক্যাল চাকচিক্যে এক রকমের টাক পড়ে যাওয়ার দশা। স্বয়ং অঞ্জনবাবু তো নিজের জামাই, মেয়ে, এমনকি বউমাকে পর্যন্ত অকুতোভয়ে মুখ্য চরিত্রে কাস্ট করা শুরু করে দিয়েছিলেন। এত আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর নিজের লেখার উপর। কিন্তু একসময় সেই আগুনে ডায়ালগ আর একপেশে গল্পগুলোও একঘেয়ে হয়ে উঠতে শুরু করল দর্শকের কাছে। তখন নয়ের দশকে নবীন পরিত্রাতা হিসেবে হাজির হল ভিন রাজ্যের টেকনিশিয়ান দল। যারা ঝটপট কাজ করতে পারে, এবং কাজটা দেখতেও ঝকঝকে হয়। ফলে প্রযোজকদের সাধ্যের মধ্যের বাজেটেই একটু অন্য স্বাদ এবং নতুন দৃশ্যগুণ এল সিনেমায়। পয়সা খরচ করে যে তামাশা দেখতে দর্শকদের আপত্তি নেই বুঝে, পরবর্তীতে ব্যাংকক, পাটায়ার মতো বিদেশি লোকেশনেও পা বাড়াল বাংলা ছবি।

সেই আমলেই জুডো রামুর বাংলায় আগমন এবং ক্রমে ক্রমে ফাইট মাস্টার হিসেবে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার। ফলে, শতাব্দী পরিবর্তনের কালে, প্রসেনজিৎ থেকে দেব— সবারই হিট ছবির টাইটেল কার্ডে জুডো রামুর নাম উপস্থিত থাকা একরকম রেওয়াজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলতে গেলে, অ্যাকশনের চল শুরু হওয়ার পর থেকে জুডো রামুই বোধহয় বাংলা সিনেমার সব চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফাইট মাস্টার বা অ্যাকশন ডিরেক্টর। কাছাকাছি হিসেবের মধ্যে আসতে পারতেন একমাত্র যে বাঙালি অ্যাকশন ডিরেক্টর, সেই শান্তনুদা মারা গিয়েছেন এই ২০১৭ সালেই।

যা-ই হোক, যে সময়ের কথা বলছি, সেই ২০০৯ সালে, আমাদের এই শুটিংটি অবশ্য সিনেমার ছিল না। নতুন নতুন বেসরকারি বাংলা চ্যানেলের আগমনে বাজার তখন রীতিমতো গরম। সিনেমার চেয়ে অনেক বেশি রমরমা হাল সিরিয়ালের। কারণ অবিশ্বাস্য আকাশচুম্বী বাজেটও তখন অনায়াসে চ্যানেলের অনুমোদন পেয়ে যাচ্ছে। তাই সিনেমার পুরনো ডিরেক্টররা অনেকেই সিরিয়াল পরিচালনার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আবার সিরিয়াল এবং রিয়্যালিটি শো-তে হাত পাকানো অনেক ডিরেক্টরকে দেখা যাচ্ছে তাঁদেরকে পালটা চাল দিতে। অর্থাৎ তাঁরা সিনেমা বানাতে লেগে গেলেন। বক্স অফিসে যেগুলোর কোনওটা কোনওটা হিটও হয়ে লেগে যেতে লাগল।

মোটের উপর, সিরিয়ালকে কেন্দ্র করে ইন্ডাস্ট্রিতে তখন লক্ষ্মী আর সরস্বতী উভয়েই হয়েছেন অচলা। আমাদের এ সিরিয়ালের পাইলট এপিসোড শুট তার আদর্শ উদাহরণ বলা যেতে পারে। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত আয়োজন এখানে এতটাই রাজকীয় যে, বড় বাজেটের সিনেমা শুটিংকে হার মানিয়ে দেবে! আর ঘটনাচক্রে যেহেতু সেই এপিসোডখানা ছিল টেলিভিশনের জন্য লেখা আমার প্রথম সিরিয়াল, আমার তো আনন্দে আত্মহারা দশা হওয়ার কথা।

কিন্তু বিধি বাম। ফিল্ডে নেমে দেখছি, টেনশনে সারাক্ষণ স্নান। এই যে চড়া ভাড়া দিয়ে বন্দুকগুলো আনা হয়েছে, আদৌ সেগুলো আজ শুটিং-এ ব্যবহার হবে কি না, সেটা না আমি জানি, না জানে জুডো রামু। আজ যদি শট না হয়, কাল তবে আবার ভাড়া গুনে এগুলো আনানোর ব্যবস্থা করতে হবে! তাই, এতদিন টাইট বাজেটে কাজ করে আসা মানসিকতা আমার মনের মধ্যে অবিরাম অ্যালার্ম বেল বাজিয়ে চলেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এত খরচের সত্যিই কি কোনও মানে আছে?

তাই স্বাভাবিকভাবেই, জুডো রামুর করুণ স্বরের অভিযোগ শুনে আমি রীতিমতো আন্দোলিত। ফ্লোরে আমি শুধু এপিসোড লেখক নই। যেহেতু আমাদেরই প্রোডাকশন হাউস, তাই আমি কার্যনির্বাহী প্রযোজকও বটে। তাই তৎক্ষণাৎ ছুটলাম সৌমকের সন্ধানে, যে কিনা এই পাইলট এপিসোডের ডিরেক্টর কাম ডিরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি।

কিন্তু চারদিকে শতখানেক লোকের ভিড়ে তাকে খুঁজে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! খিদিরপুরে রিমাউন্ট রোডের কাছে এক পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরির ভিতরে এই লোকেশন। একে তো বিরাট শেডখানায় জানালাপত্রের কোনও বালাই নেই। তদুপরি কৃত্রিম আলোর পরিবেশ তৈরি করতে যত ঘুলঘুলি ও ফাঁকফোকর ছিল, সেসব ত্রিপল আর কালো কাপড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ফ্লোরে ব্রেক চলছে বলে ভিতরে এখন অল্প কয়েকটা বাল্‌ব জ্বলছে মাত্র। তাতে যত না আলো সৃষ্টি হচ্ছে, ছায়া তার চেয়ে অনেক বেশি।

ভিতরের এই অন্ধকারকে বিউটি কনটেস্টে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে একটাই ছেলে। সে হল অন্ধকারের চেয়েও কালো, আমাদের সহকারী সংলাপ লেখক পেলে। এক কোণে একটা নড়বড়ে টেবিল-চেয়ারে সে বেচারি সকাল থেকেই অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। চ্যানেল কর্তৃক সম্পূর্ণ অনুমোদিত স্ক্রিপ্টের প্রিন্ট আউট তো সবারই হাতে হাতে ঘুরছে। তবে, পেলেভাই উইকেটকিপারের মতো হামা দিয়ে বসে আছে কেন? আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, শুটিং ফ্লোরে বসে ব্যাটা আবার নতুন করে কী লিখবে? সব লেখালেখি খতম হওয়ার পরেই তো শুটিং শুরু হওয়ার কথা!

এই প্রশ্নটা আমারও মাথায় জেগেছিল, যখন চ্যানেলের তরফের ক্রিয়েটিভ প্রোডিউসার শুভংকর সক্কাল সক্কাল এই ব্যবস্থাটি করার জন্য আমাকে (হুকুম আবৃত) অনুরোধটি জানায়। সদ্য সদ্য মুম্বই থেকে আগত এই ব্যক্তি কলকাতায় আসা ইস্তকই মুহুর্মুহু হুলুস্থুলু সৃষ্টি করে যাচ্ছে। কারণ যখন-তখন নতুন নতুন আইডিয়া চলে আসে

তার মাথায়। এবং সেই আইডিয়ার কাঁঠাল তুরন্ত যার মাথায় ইচ্ছেমতো ভাঙা যায়, ফ্লোরে তেমন একজন সর্বক্ষণের লেখক চাই তার। প্রায় প্রতি দৃশ্যেই অযাচিতভাবে শুভংকর কিছু না কিছু উদ্ভট ভাবনা তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করছে। তারপর পেলেকে দিয়ে তা লেখাচ্ছে এবং ক্রমাগত নিজেই সে লেখা রিজেক্ট করছে। প্রতিবারই তার একটাই বক্তব্য... আইডিয়ায় কোনও দোষ নেই... শুধু লেখাতে গুণের অভাব! তার এই প্রবণতার আন্দাজ হওয়ামাত্রই, আমি সেফটি প্রিকশন হিসেবে সবসময় তার থেকে কুড়ি মানুষ দূরত্ব বজায় রেখে চলা আরম্ভ করেছি। আর বেচারি পেলে, অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার হয়েও, আত্মগোপন করতে একেবারেই ব্যর্থ। কারণ ওকে একটা উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্প দিয়ে চেয়ার-টেবিল পেতে মধ্যমণি করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। একবার ভাবলাম, ওই টেবিল ল্যাম্পখানাই হাতিয়ে নিয়ে সৌমককে খোঁজার চেষ্টা করব কি না! তারপর অবশ্য নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেকেই ধিক্কার দিলাম। আরে ধুত্তোর! পকেটে মোবাইল ফোনটা কীসের জন্য আছে?

ফোন করতে সৌমকের খোঁজ পাওয়া গেল। সে নাকি আসলামকে সঙ্গে নিয়ে পান কিনতে বেরিয়েছিল। কিন্তু তারপর ধুন্ধুমার বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙে। ফলে, ওরা দু'জনই আটকে গিয়েছে।

এমন নিঃশব্দ বৃষ্টির কথা আমি জীবনে শুনিনি। ফোনে একটা শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে বটে। কিন্তু মাথার উপরের অ্যাসবেস্টসের ছাদ একেবারেই সাইলেন্ট মোডে রয়েছে। তাই, ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে শেডের বাইরে মাথা বার করলাম। ও মা! কোথায় বৃষ্টি? অল্প কিছু গয়ংগচ্ছ মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখছি না তো? তাই ফোনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বৃষ্টি কোথায়?

সৌমক উত্তরে জানাল, মোমিনপুরে। আর, আমি একেবারে আঁতকে উঠলাম সে কথা শুনে।

—মোমিনপুরে? মোমিনপুরে কেন?... মানে, তুমি মোমিনপুরে কেন?

—আরে, আসলাম বলল, এখানে নুরচাচার দোকানে ওয়ার্ল্ড ফেমাস বরফ-পান পাওয়া যায়...

গা জ্বলে গেল আমার আসলামের নাম শুনে। সৌমকের পরিচিত বন্ধু সে। এবং এই অঞ্চলে তার বাড়ি বলে, রিমাউন্ট রোডে এই চমৎকার লোকেশনটির ব্যবস্থা তার মাধ্যমে অতি সহজে করা গিয়েছে। কিন্তু সেই অবদানের মূল্য চোকাতে হয়েছে একটি ভয়ংকর শর্তে। তাকে অভিনয়ের সুযোগ দিতে হয়েছে ভিলেনের চরিত্রে। একে তো সকাল থেকে গন্ডায় গন্ডায় রিটেক হয়ে চলেছে এই গন্ডারের মতো ঘাড়ে-গর্দানে ছেলেটির জন্য। তার উপর এখন আবার বাইকে চাপিয়ে সৌমককে নিয়ে সে চলে গিয়েছে বরফ-পান খাওয়াতে। ভগবানের দিব্যি, সেই মুহূর্তে কয়েক চাঁই মড়া চাপা দেওয়ার বরফ যদি পেতাম! ওকে তা-ই দিয়ে চেপে মারলে, তবে বোধহয় আমার মনে খানিক প্রশান্তি ফিরে আসত!

ভীষণ রেগেমেগে আমি শেড থেকে বেরিয়ে একটু একাকিত্বের সন্ধানে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাইরে পা রাখতেই এসি মেকআপ ভ্যানের দরজা খুলে হাঁক পেড়ে আমায় ডাকলেন জর্জ বেকার, হ্যালো... আপনি কি এখন একটু ফ্রি আছেন? আমার ডায়ালগগুলো নিয়ে কিছু বিশেষ আলোচনা করার ছিল।

আমার জবাবের কোনও অপেক্ষা করলেন না ভদ্রলোক। হাতের কাগজগুলো ঘেঁটে একটি পাতা বার করে ফেললেন। তারপর জোরে জোরে পড়তে লাগলেন একটা লাইন,

—এই যে এই লাইনটা... 'আফ্রিকার গহিন জঙ্গলে আমি স্বচক্ষে দেখেছি... নেকড়ের পাল একটা সিংহকে দেখতে দেখতে পুরো ঘায়েল করে ফেলল'... লাইনটা কনফিউজিং না? ডু ইউ থিঙ্ক, দেয়ার আর উল্ভ্স ইন আফ্রিকা? আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, জানেন? গুগ্‌লে একটু ক্রস চেক করে দেখুন তো... আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, এই ডায়ালগ আমি লিখিনি মশাই। পেলের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে এটা লিখতে বাধ্য করেছে চ্যানেলের বরপুত্র শুভংকর।

বহু কষ্টে ঢোক গিলে ঠোঁটের ডগায় চলে আসা কথাগুলোকে কোনওমতে আটকালাম। তারপর কপালের ঘাম মুছে বললাম, আমি একটু পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। জেনারেটরের তেল ফুরিয়ে আসছে শুনলাম। আগে ওটার ব্যবস্থা না করলে আপনাদের মেকআপ ভ্যানের এসি দুম করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

—অ্যাঁ, সে কী! তাহলে তো আমাকে কস্টিউম খুলে ফেলতে হবে! কী বিপদ!

জর্জ বেকার নিজের পরনের লালরঙা ভারী কোটটির দিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন। ইনি পুরনো আমলের ডেডিকেটেড শিল্পী। কাঁটায় কাঁটায় কল টাইম মিলিয়ে ফ্লোরে এসে মেকআপ করবেন। তারপর একটুও সময় নষ্ট না করে, কস্টিউম পরে বসে যাবেন চরিত্রে মনোনিবেশ করতে। ফ্লোরে কতক্ষণে ডাক পড়বে, তার কোনও ঠিক নেই। এই যেমন, আমাদের এই শুটিং-এ আজ রাত আটটা-ন'টার আগে ওঁর সিন শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু উনি ততক্ষণ অবধি ফুল কস্টিউম পরে, মনেপ্রাণে একদম চরিত্রের সঙ্গে মিশে ডাক আসার অপেক্ষা করতে থাকবেন। বয়স হয়েছে বলে আজকাল বড় চরিত্রে সুযোগ একেবারেই আসে না। তাই যেন, যেটুকু আসে, তাতেই নিজেকে সম্পূর্ণ নিংড়ে দিতে চান।

—ভয় পাবেন না... তেলের ব্যবস্থা করতেই তো আমি যাচ্ছি!

আমি ওঁকে আশ্বস্ত করলাম। এবং নিজে, প্রচুর অস্বস্তিতে ছটফট করতে করতে এগিয়ে চললাম প্রোডাকশনের গাড়ির খোঁজে। আর কারও উপর ভরসা করে দরকার নেই বাবা। গাড়ি নিয়ে নিজেই বরং চলে যাই বরফ-পানের দোকানে। আমাদের স্টার ডিরেক্টর কাম ক্যামেরাম্যানকে বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার করে না আনলে যে কার্যোদ্ধার হবে না!

বন্দরমুখী বিরাট বিরাট কন্টেনারবাহী ট্রেলার-ট্রাকদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে গাড়ি চলছে মোমিনপুরের দিকে। আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি মনে মনে রিওয়াইন্ড করে ফিরে চলেছি আজকের এই বিরাট কর্মযজ্ঞটির একদম শুরুর ধাপে।

তখন কোথায় সৌমক, আর কোথায় শুভংকর? মুম্বইতে নিজের নিজের কাজে দু'জনেই ব্যস্ত। আর এদিকে, চ্যানেলের সঙ্গে প্রথম মিটিং-এ একা আমি। হাতে একখানা সাদা পৃষ্ঠা আর পেনসিল। গল্প লেখার জন্য নয়। চ্যানেল কর্তার ব্রিফ নোট করার জন্য।

এই গল্পটা আসলে লেখার কথা ছিল রূপকদার। অর্থাৎ প্রথম সারির বাংলা দৈনিকের এক সময়ের বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক এবং পরবর্তীতে সেই একই প্রকাশনার চলচ্চিত্র পত্রিকার সম্পাদক রূপক সাহার। চ্যানেলের প্রাথমিক ব্রিফ নিয়ে যে দিন প্রথমবার রূপকদার গল্‌ফ গ্রিনের বাড়িতে গেলাম, দূরদর্শী মানুষটি মৃদু হেসে বলেছিলেন, চ্যানেল যা লেখায়, শেষ পর্যন্ত সেটাই কি দেখায়?

এখন, মোমিনপুরের দিকে মুখ করে, আমি নিঃশব্দ একটা সেলাম জানালাম দাদাকে। সাক্ষাৎ সর্বভেদী দৃষ্টি না হলে, আগে থাকতে এত বড় সত্য আবিষ্কার করা বাস্তবিকই অসম্ভব।

রূপকদার কথায় পরে আসছি। আগে বরং চ্যানেল কর্তার ব্রিফ কী ছিল, সেটা শুনুন...

মাফ করবেন! বলতে গিয়েও আটকে গেলাম। সিরিয়ালের ভাষায় একে বলে ফ্রিজ ফ্রেম। মানে, সব চেয়ে জরুরি কথাটি বলার আগেই অবধারিতভাবে সে দিনের পর্বটি খতম হয়ে যায়।

এইটুকু সাসপেন্স থাক তাহলে? বাকিটা আবার পরের দিন!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

প্রাক্ পূজা

ডুয়ার্স পরিক্রমা

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

বহুদিন পর সহজ কথায় তিন যুগ বাদে আমার প্রিয় তিন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের লোভে কলকাতায় পৌঁছে, টিংকুর বাড়িতে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম দমদমের উদ্দেশে। রিটায়ার করে আমার অগ্রজসম মৃণালদা, বুড়োদা (প্রশান্ত গুপ্ত) এবং পরমমিত্র স্যাটা (সঞ্জিত সাহা) দমদমে একই পাড়ায় কাছাকাছি বাস করে। সম্পর্কের লেভেলটা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। মৃণালদার বাড়িতে এক কাপ চা খেয়ে হাজির হলাম প্রশান্ত গুপ্তর বাড়ি। অনেক পুরনো গল্প, পুরনো হারিয়ে যাওয়া মানুষের নাম বারবার উঠে আসছিল। বুড়োদার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে কিছুটা আড্ডা মারলেন এবং একটা জম্পেশ জলখাবারের আয়োজন করেছিলেন।

সে দিন স্যাটার শরীরে সামান্য কিছু সমস্যা ছিল। আসতে পারেনি বুড়োদার বাড়ির আড্ডায়। আমরা তিনজন স্যাটার বাড়িতে গিয়ে পুনরায় আড্ডা জমালাম। আসলে আমরা সাতের দশকে একসঙ্গে কাঁচরাপাড়ার কাছে মোহনপুরে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চাকরি করেছি। একসঙ্গে মেস লাইফ কাটিয়েছি। একসঙ্গে টুকটাক ঘোরাফেরা করেছি।

বেড়ানোর কথা উঠতেই অবসরপ্রাপ্ত তিন তরুণ মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। প্রত্যেকের নানা সমস্যা আছে, কাজেই— কাজেই সাত দিনের একটা ছোটখাটো ট্রিপের জন্য নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চালানোর পর ঠিক হল, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ওরা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে আলিপুরদুয়ার জংশনে নামবে, আমি ওদের রিসিভ করব। ওদের ২২ সেপ্টেম্বর ফিরতে হবে। ওরা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল, ওদের বেড়ানোর সবরকম ব্যবস্থা ইকনমি বজায় রেখে করে দিতে হবে। সে সময়টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবপ্রসাদ রায় ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক। প্রায়ই তখন আলিপুরদুয়ারে যেতাম। নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে বন্ধুর তৎপরতা লক্ষ করতাম। সঙ্গে অফুরান আড্ডা ও গ্রামে ঘুরে বেড়ানো। আর লক্ষ করতাম, সমগ্র ডুয়ার্সে কী বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে পর্যটনের মাধ্যমে।

মিঠু (দেবপ্রসাদ রায়) যে বাড়িটায় আলিপুরদুয়ারে থাকত, সেটির নীচতলা পাকা, দোতলাটা ছিল কাঠের দেওয়াল, উপরে টিনের চাল। চওড়া বারান্দায় একজোড়া নিরীহ অ্যালসেশিয়ান কুকুর বাঁধা থাকত। বাড়ির সামনে প্রশস্ত বাগানে নানা ফুলের গাছ। শীতকালে প্রায় ৫০০ টবে নানা মরশুমি ফুলে বাড়ির চেহারাটাই কেমন দেবপুরী মনে হত। আমি কলকাতার বন্ধুদের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, ট্রেনের কামরায় প্রায়ই রাতদুপুরে আরশোলা হানা দেয়। তা ছাড়া বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মিঠুর দু'বার মোবাইল ফোন চুরি গিয়েছে।

আমি নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে হাজির। আধ ঘণ্টা বিলম্বে কাঞ্চনকন্যা আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছাল। আমি দলবল নিয়ে অটোতে চেপে চলে এলাম 'এলিট পর্যটক আবাস'-এ অর্থাৎ যে বাড়িতে মিঠু থাকত।

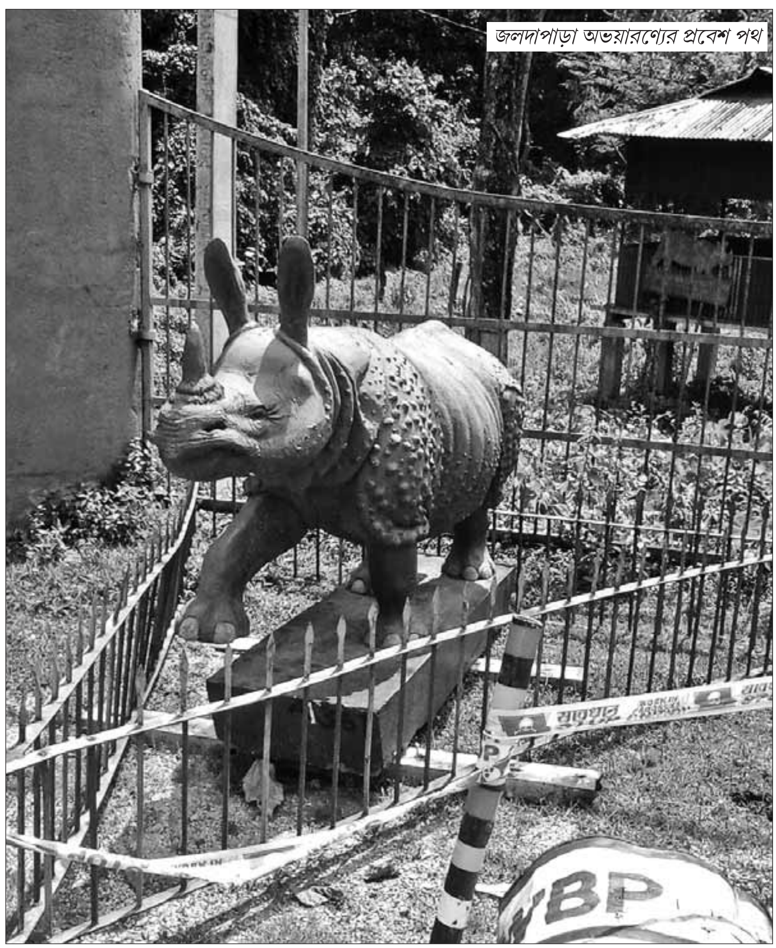

জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের প্রবেশ পথ

এমনিতে আলিপুরদুয়ারে খাওয়ার জন্য ছোটবড় নানা হোটেল আছে। তবে মিঠুর বাড়িতে যে মহিলা রান্না করত, তাকে দিয়ে বোরোলি মাছ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক রান্না করা হয়েছিল। সে সময়টা মিঠু কলকাতায় ছিল, কাজেই আমার নিজের নানারকম অসুবিধা ছিল। মিঠু থাকলে চিন্তা নেই।

পর্যটক আবাসে এসেই ওরা শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের পথের বর্ণনা দিয়েছিল। শিলিগুড়ি জংশন ছাড়তেই শুরু হয় চা-বাগান ও জঙ্গল। চিরসবুজ। প্রথমে গুলমা স্টেশন, মোটামুটি গভীর বনের মধ্যে— রাস্তায় ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল মানেই হাতির দল রেললাইনে টহলদারি চালাচ্ছে। তারপর সেবক রেল স্টেশন। এবার তিস্তা নদী পার হয়ে ট্রেন ব্রিজের উপর ঝমঝম শব্দ তুলে জংলা পথেই চলে ট্রেন। দুটো মাঝারি মাপের টানেল পার হওয়ার পর শুরু হয় পাহাড়ি ছোট ছোট ঝরনা, বনের ধারে গ্রাম আর দিগন্তবিস্তৃত চা-বাগান। ট্রেন থামে মাল স্টেশনে। এই স্টেশনে এক বিহারি বাবুর তৈরি পুরি-তরকারি, সঙ্গে চা নিয়ে পরখ করে দেখতে পারেন। এসব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প হয়েছে বহুবার তাই পথের খুঁটিনাটি ওদের জানা ছিল। মালবাজার ছাড়ার পর পুরো পথটাই সমতল। তবে তিনটি বড় রিজার্ভ ফরেস্টের ভিতর দিয়ে যাত্রাপথ— চাপড়ামারি, জলদাপাড়া এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভ। পথে প্রায়ই গজরাজকুলের পথপরিক্রমা। ট্রেনকে অপেক্ষা করতেই হয়। প্রশাসনিক নির্দেশে ট্রেনের গতিপথ বাঁধা আছে, তবুও আচম্বিতে হাতির দল রেলপথে উঠে আসে। সরাসরি সংঘর্ষ। গত তিন বছরে প্রায় ৭০টি হাতির মৃত্যু ঘটেছে। ট্রেনের গতি শিলিগুড়ি ছাড়ার পর মন্থর। মালবাজার থেকে ট্রেন পৌঁছায় আর একটি স্বপ্নসুন্দর ছোট পাহাড়-ঘেঁষা স্টেশনে, চালসা। পথে ঘন সবুজ চা-বাগান, ছোটবড় অসংখ্য পাহাড়ি নদী। প্রায় গা ঘেঁষেই চলে গিয়েছে পিচের রাস্তা। এবার নেওড়া ভ্যালি অতিক্রম করে ট্রেন ঢুকে পড়বে শতাব্দীপ্রাচীন চাপড়ামারি বনে। অনলাইন বুকিং করে চাপড়ামারি বনবাংলোয়, একরাত সারাজীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকতে পারে। আর বাংলোর সামনে লবণ রাখা জায়গাটায় হরিণ, শম্বর, ময়ূর এবং গজরাজের দেখা মিলতেই পারে। ভাগ্য ভাল থাকলে পথভোলা কোনও গুন্ডা গন্ডারের সাক্ষাৎও পেতে পারেন। এরপর ট্রেনটি একই রকম দৃষ্টিনন্দন পথে বীরপাড়া, মাদারিহাট, হাসিমারা, কালচিনি, রাজাভাতখাওয়া হয়ে আলিপুরদুয়ার জংশনে যাত্রাবিরতি। রাজাভাতখাওয়া নামটির সঙ্গে এক প্রাচীন ইতিহাস জড়িয়ে আছে। কোচবিহার মহারাজের সঙ্গে ভুটানরাজের যুদ্ধের সমাধানকল্পে দু'পক্ষের আলোচনাস্থলে রাজকীয় ভোজনের আয়োজন করা হয়। রাজারা ওই স্থানে ভাত খেয়েছিলেন বলে স্থানের নাম রাজাভাতখাওয়া। আলিপুরদুয়ারে বন্ধুরা পৌঁছে, ফ্রেশ হয়ে একেবারে খাবার টেবিলে। বোরোলি মাছের চচ্চড়ি ও বোরোলির ঝোল খেয়ে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বিশ্রাম।

তখন বেশ গরম ও রোদ, আমরা অটোতে চেপে আধ ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম। রাজাভাতখাওয়া অরণ্যগ্রাম। ওখানে বন দপ্তরের পরিচালনায় একটা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র এবং সঙ্গে সুন্দর একটা

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। রাস্তার ওপারেই উঁচু খুঁটির উপর টারজানের বাড়ির মতো আটপৌরে একটা লজ আছে। পাশে অনেকটা উন্মুক্ত হোটেল। তখন সন্ধে নামছিল। আমরা চা খেতে চাইলাম। তখন বুনো গন্ধ-মাখা শিরশিরে হাওয়া বইছিল। খোলা কাঠের উনুনে দেশি মুরগির মাংস রান্না হচ্ছিল। আমরা হোটেল মালিককে বললাম, আমাদের চারজনের জন্য মাংস-ভাত খাবার ব্যবস্থা হবে কি?

সেমিনার হল আছে। হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। রাস্তার ওপারেই উঁচু খুঁটির উপর টারজানের বাড়ির মতো আটপৌরে একটা লজ আছে। পাশে অনেকটা উন্মুক্ত হোটেল। তখন সন্ধে নামছিল। আমরা চা খেতে চাইলাম। তখন বুনো গন্ধ-মাখা শিরশিরে হাওয়া বইছিল। খোলা কাঠের উনুনে দেশি মুরগির মাংস রান্না হচ্ছিল। আমরা হোটেল মালিককে বললাম, আমাদের চারজনের জন্য মাংস-ভাত খাবার ব্যবস্থা হবে কি? আমি সন্ধের পর ডুয়ার্সে যানবাহনের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। আমি বললাম, 'সন্ধে হয়ে গিয়েছে, খেতে এখনও এক ঘণ্টা লাগবে। ভাত রান্না হয়নি। কাজেই আজকের এই অভিযান শেষ করে ফিরতে হবে।'

ইতিমধ্যে চা এসেছিল। হোটেলের মালিক বললেন, 'এখান থেকে আপনাদের আমিই ফেরত পাঠাব। রাত সাড়ে আটটায় নাড়ুর অটো আপনাদের পৌঁছে দেবে। ভাড়া একটু বেশি লাগবে, চারজনের একশো টাকা। আমার হোটেলের মাংস-ভাত না খাইয়ে আপনাদের যেতে দেব না।' প্রমাদ গুনলাম। যদি নাড়ুর অটো না আসে, তবে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার রাত শুরু হবে। ইতিমধ্যে ওই টারজানমার্কা হোটেল থেকে ছ'টি ছেলেমেয়ে এসে এই খাওয়ার হোটেলে হইচই শুরু করে দিল। মহিলা দু'জন বিবাহিতা। দু'জন ওদের স্বামী, অন্য দু'জন ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা ছ'জন পরস্পরকে তুই সম্বোধন করছিল। ঘড়িতে রাত আটটা। চারদিকে অসংখ্য জোনাকির মেলা। একটা ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করল না থেমে। অবিরাম ঝিঁঝির ডাক। তখন এই জঙ্গল এলাকায় মোবাইল ফোনের সিগন্যাল খুব খারাপ ছিল। হঠাৎ স্যাটার মোবাইল বেজে উঠেছিল। স্যাটা বলেছিল, 'সিগন্যাল খারাপ। কথা শোনা যাচ্ছে না। আমরা ভাল আছি।' তারপর আর কোনও কথা শোনা যায়নি বা বারবার চেষ্টা করেও ফোন করা সম্ভব হয়নি।

দূরে দূরে বাড়ি বা অফিসগুলোতে আলো জ্বলছিল। হঠাৎ ঝুপ করে সমস্ত আলো নিবে গেল। অখণ্ড লোডশেডিং। একটু দূরে একটা অটোর আওয়াজ এবং নিকটে ময়ূরের কর্কশ ডাক শোনা গেল। হোটেলের অল্পবয়সি নেপালি কাজের ছেলে বিষ্ণু জানাল, 'নাড়ুদার গাড়ি আসছে।' তখন ভাত টগবগ করে ফুটছে। বিষ্ণু বলেছিল, 'নাড়ুদা মাংস-ভাত না খেয়ে যাবে না।' অন্ধকার ভেদ করে নাড়ুর অটো ছুটে এল। নতুন অটো, দারুণ সাজানো। নাড়ু এসে বসল, একটু ফুরফুরে ভাব। গা থেকে হালকা দেশি মদের গন্ধ আসছিল। আমরা চারজন ওর গাড়িতে যাব শুনে খুব খুশি।

ও দিন রাতে চারপাশ খোলা ওই হোটেলে রাতের ওই গরম ভাত এবং ফুটন্ত মুরগির মাংসের ঝোল দিয়ে ডিনার ভোলা যাবে না। রাজভাতখাওয়া বহুদিন যাওয়া হয়নি। বর্তমানে থাকা বা খাওয়ার ভিন্ন দু'টি হোটেলের খবর জানি না, তবে ওরা নিশ্চয়ই থাকবে। সম্ভব হলে ওই টারজানমার্কা হোটেলে একটা রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর রাত কাটাতে পারেন। পাশের হোটেলে অর্ডার দিলে নিশ্চয় মুরগির মাংস-ভাত পাওয়া যাবে। রাজভাতখাওয়াতে বন দপ্তরের একটা বড়সড়ো বাংলোবাড়ি আছে। অনলাইন বুক করে আসতে পারেন। ইদানীং আশপাশে দু'-চারটি ছোটবড় লজ তৈরি হয়েছে। তবে সে দিন রাতে প্রায় ন'টার সময় জঙ্গলের বুক চিরে আমাদের অটোর সেই

যাত্রার স্মৃতি এখনও অমলিন। দম বন্ধ করে অটোতে বসে, কারও মুখে কোনও কথা নেই। মাত্র কুড়ি মিনিটেই দমনপুর, তারপর আলিপুরদুয়ার জংশন। প্রচুর আলো, অনেক মানুষ। পরদিন একই পথে সকালে আবার আসব।

পরদিন খুব ভোরে উঠে প্রস্তুতি নিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চৌপথি থেকে স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে চেপে যাত্রা করলাম জয়ন্তির পথে। মোট ৩১ কিমি পথ। রাজভাতখাওয়া পৌঁছে জয়ন্তি গেটের সামনে বাস থামল। ভ্রমণকারীদের জন্য বন দপ্তর খুব সামান্য অর্থে গহন বন (কোর এরিয়া)-এ যাওয়ার জন্য অনুমতিপত্র দিয়ে থাকে। উঁচু কাঠের তৈরি তোরণ। বাস ঢুকে পড়ল গভীরতম আদিম অরণ্যপথে। প্রায় ১০ কিমি যাত্রা করার পর জয়ন্তির ৫ কিমি আগে রাস্তা বামে গিয়েছে সানতালাবাড়ির দিকে, আর ডান দিকের পথ গিয়েছে জয়ন্তি। দুটো স্থানের দূরত্বই ৫ কিমি। সানতালাবাড়ি থেকে সামান্য ট্রেক করে চড়াই-উতরাই ভেঙে পৌঁছানো যাবে দুটো দারুণ স্পটে— সিনচুলা এবং বক্সা দুয়ার। প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে রূপের ডালি দিয়ে ছোট্ট জনপদ দু'টিকে মোহময়ী করে সাজিয়েছে। বক্সা ফোর্টে একসময় বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের

জয়ন্তী নদীর ওপারে পাহাড়

বনের পথে নদীর বয়ে যাওয়া

জয়ন্তীর রাস্তায় টংঘর

ব্রিটিশরা বন্দি করে রাখত। কালের অমোঘ নিয়মে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। যা-ই হোক, যেহেতু আমরা যাচ্ছি জয়ন্তি, কাজেই ওখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। আমরা সকাল সাড়ে আটটায় পৌঁছালাম জয়ন্তি। প্রবেশপথের বাম দিকে এসএসবি ক্যাম্প এবং বন দপ্তরের গেট। আমরা জয়ন্তি পৌঁছে পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের নদীর ধার-ঘেঁষা বাংলোর দুটো ঘরের দখল নিলাম। বাংলোর স্টাফরা খাবারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, দাম নাগালের মধ্যে। একটু চা-টা খেয়ে নদীর বুকে নুড়িপাথর ও বালি ঠেলে কিছুটা এগিয়ে নদীর দেখা মিলল। এক সময় নদীর উপর সেতু ছিল। এখনও দু'-তিনটে থাম দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯৩ সালের বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায় সেতু। জয়ন্তির ওপারে নদী টপকে পদব্রজে যেতে হয় এখন। জয়ন্তির নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওপারে সারিবদ্ধ নীল পাহাড়। মাথায় তাদের সাদা পাগড়ির মতো জড়িয়ে আছে মেঘমালা। এ এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

নদী পার হয়ে পাহাড়-অরণ্যর মাঝে ট্রেক করে ছোট মহাকাল প্রায় ৫ কিমি, আরও ২ কিমি দূরে বড় মহাকাল। প্রাচীন মন্দির। নিয়মিত পূজাপাঠ হয়। স্থানীয়

একটু চা-টা খেয়ে নদীর বুকে নুড়িপাথর ও বালি ঠেলে কিছুটা এগিয়ে নদীর দেখা মিলল। এক সময় নদীর উপর সেতু ছিল। এখনও দু'-তিনটে থাম দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯৩ সালের বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায় সেতু। জয়ন্তির ওপারে নদী টপকে পদব্রজে যেতে হয় এখন। জয়ন্তির নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওপারে সারিবদ্ধ নীল পাহাড়। মাথায় তাদের সাদা পাগড়ির মতো জড়িয়ে আছে মেঘমালা। এ এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

মানুষদের অবিচল ভক্তি আর প্রাকৃতিক দৃশ্য স্থানমাহাত্ম্য বাড়িয়েছে। যদিও বন বিভাগের অনুমতি নেই, তবুও বড় মহাকাল মন্দির পেরিয়ে আরও কঠিন, আরও আদিম পাহাড়ি পথে ট্রেক করে পৌঁছে যাওয়া যায় লেপচাখা অথবা বক্সা। লেপচাখার ওই কাঠের দোতলায় চায়ের পেয়ালা হাতে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীপথ গোচরে আসে। অনবদ্য অভিজ্ঞতা। দুটো রাত জ্যোৎস্নাস্নাত জয়ন্তীর রূপে মোহিত হয়েছি। আমার বারবার আসার সুযোগ থাকছে কিন্তু কলকাতার বন্ধুদের সে সুযোগ নেই।

ব্রিটিশ রাজত্বে জয়ন্তী অনেক বেশি ব্যস্ত জনপদ ছিল। ট্রেন চলত। মূলত ডলোমাইট, পাথর, কাঠ এখান থেকে রপ্তানি হত। মালগাড়িতে জুড়ে দেওয়া হত একটা যাত্রীবগি— স্থানীয় মানুষদের জন্য। যারা জয়ন্তীর পুরনো মানুষ তারা ৩১ ডিসেম্বর তারিখটা দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করে। কারণ ১৯৮৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর রেলপথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এলাকাটিতে বাঙালি, নেপালি এবং কিছু বিহারী বাস করে। সবাই মূলত পর্যটনের উপর বর্তমানে নির্ভরশীল। সরকারি বাংলো দুটি ছাড়া ভাল মানের হোটেল তৈরি হয়নি। তবে স্থানীয় মানুষেরা অনেকেই নিজেদের বাড়িতে দু-চারদিনের জন্য পর্যটকদের আশ্রয় দেন। এভাবেই হোম টুরিজম চালু হয়েছে। পর্যটকদের কম খরচে থাকার ভাল ব্যবস্থা। এলাকার প্রবীণ কিন্তু সমর্থ গাইড শ্রী প্রদীপ দে (ফোন ৭৩১৯১৪২২১৮), শ্রী হিমাল ছেত্রী (৯৭৩৪৯৩৬২৮৬), শ্রী আপ্পাল নাইডু (৭৮৭২৮২৩৯৫৩), শেখর ভট্টাচার্য্য (৯৪৭৪৬২৭৭৯০) এদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে যে কোনও পর্যটকের দুঃশ্চিন্তা লাঘবে হবে।

১৮ সেপ্টেম্বর ওরা সকালে ব্রেকফাস্ট করে রওনা দিয়েছিল। বেশ কিছুটা সময় রাজভাতখাওয়াতে কেটেছিল। বনদপ্তরের ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে। আশপাশে ঘোরাঘুরি করে সবাই বুঝতে পারে বনবাস করতে গেলে আর একটু নিরাপত্তা চাইলে রাজাভাতখাওয়ার জবাব নেই। ছোট্ট ঝকঝকে রেলস্টেশন খুব আকর্ষক, পাশেই বনদপ্তরের বিশাল অতিথিশালা। একটু ব্যয় বহুল। এখানেও ছোটখাটো থাকার বেশ কিছু জায়গা গড়ে উঠেছে। আমরা দুপুর একটায় লাটাগুড়ি রওনা দিই। একটা গাড়িভাড়া করেছিলাম দু' হাজার টাকা দিয়ে। প্রথমে আমরা নিমতি ধাবাতে দুপুরের ভোজন সারলাম। আলিপুরদুয়ারের মানুষ শ্রী সুধীর দে প্রায় ২৭ বছর আগে ৩১ সি জাতীয় সড়কের ধারে নিমতি-দোমহনির কাছে এই লাইন হোটেল বা ধাবা তৈরি করেছিলেন। খাবার সুস্বাদু, দাম আয়ত্তের মধ্যে। তবে রান্নাঘরটা কালিতে আচ্ছন্ন— আর একটা ভাল টয়লেট দরকার। এই ধাবাকে সবাই

নিমতি ধাবার অভ্যন্তরে শপিং মল

নিমতি ধাবা বলেই জানে। ভেতরে প্রাত্যহিক ব্যবহারের নানা সামগ্রী বিক্রি হয়, মিনি শপিং মল বলা যেতে পারে। আবার রওয়ানা হলাম হাসিমারা পার হওয়ার পর তোর্সা সেতুতে একটু দাঁড়ালাম। ডানদিকে দূরে জঙ্গল পাহাড় আর বামে নদী চওড়া হয়ে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের পাশ দিয়ে গন্তব্যের পথে। একটু পরেই 'জলদাপাড়া জঙ্গল ক্যাম্পে' চায়ের ব্যবস্থা। বন্ধুবর বিশ্বজিৎ সাহার আতিথেয়তা মনে থাকবে। মাদারীহাট, বীরপাড়া, গয়েরকাটা হয়ে আমার ব্যক্তিগত কাজে ধূপগুড়িতে ১০ মিনিটের যাত্রাবিরতি। ধূপগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ির পথে হুসলুডাঙ্গার মোড় থেকে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে ডুয়ার্সের অন্যতম প্রাচীন জটিলেশ্বর মন্দির দর্শন করে আবার বিরতি— চা খেতে, ঝাঝাঙ্গি ধাবাতে। সারা উত্তরবঙ্গ তো বটেই কেউ কেউ বলেন সারা ভারতে এত বড় মাপের লাইন হোটেল বা ধাবা নেই। সুযোগ এলে ঝাঝাঙ্গির কথা বিস্তারিতভাবে জানাব। একটা লাড্ডুর দাম ৩০ টাকা। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মনে হতে পারে 'স্বচ্ছ ভারত মিশনের মডেল'।

প্রায় সন্ধের মুখে আমরা এলাম লাটাগুড়ির পিডব্লুডি-র বাংলোয়। সরকারিভাবে ব্যবস্থা করা ছিল। বিশাল ক্যাম্পাস জুড়ে কাঠের বাংলো। দোতলার বিশাল বারান্দায় কফি মগ নিয়ে আড্ডা জমে উঠল। সামনে বিশাল পুকুর— পাশে লেক ভিউ হোটেল, একটু দূরেই বনের বিশাল গাছগুলো প্রহরীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে। মনে পড়ে সেদিন দেরীতে চাঁদ উঁকি মেরেছিল। পথের সব ক্লান্তি ঠান্ডা স্নিগ্ধ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ওই দিন বাংলোর রান্নাঘরে এক আদিবাসী কর্মী দারুণ মুরগির ঝোল রান্না করেছিল। ওই বারান্দায় রাতের খাওয়া আর রাত একটা পর্যন্ত আড্ডা চলেছিল।

সকালে উঠেই হেঁটে পৌঁছে গেলাম ইন্টার প্রিটেশন সেন্টারে। লাইন দিয়ে 'যাত্রা প্রসাদ' (অরণ্যের গভীরে পশু পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা) মিনারের টিকিট কাটলাম। সে সময় জনপ্রতি প্রায় দু'শত টাকা খরচ হয়েছিল। সামনেই একটা দোকানে টোস্ট-ওমলেটে টিফিন সেরে আমাদের নির্দিষ্ট সবুজ জিপসি জিপ গাড়ির পাশে দাঁড়ালাম। গাইড এক অল্প বয়সী তরুণ। ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল। জিপসি ছুটল গরুমারা গেটের দিকে। গেটের সামনে কৃত্রিম একটি গন্ডারের মূর্তি। একটু পরেই গরুমারা বনবাংলোর কাছে— হাতিশাল। এখানে পোষমানা হাতির দল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার করে। তারা সব বনদপ্তরের কর্মীর মর্যাদা পায়। প্রায় ১০টি জিপসিতে পর্যটকরা এসেছে। যাত্রা প্রসাদে দাঁড়াতেই দূরে গোটা চারেক গন্ডারকে খুব ধীরে ঘাস খেতে দেখা যাচ্ছিল। একটি গন্ডারের পিঠে একটা সাদা বক। একঝাঁক শিং ওয়ালা হরিণের দল মাঠ দিয়ে ছুটে যায়। ময়ূর ও সম্বর দর্শন হয়েছিল। কিন্তু বন্য গজরাজের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। বাংলোতে ফিরতে ফিরতে দুপুর। এবার বাসে চেপে এলাম চালসা মোড়। সেখান থেকে শেয়ার জিপে সামসিং। তুষার চৌধুরী সামসিং ব্রাঞ্চের তখন ম্যানেজার ছিল। সে ব্যাঙ্কের উপরতলায় দুটো ঘরের ব্যবস্থা করেছিল। মনে আছে ম্যানেজারের খাতিরে ভাড়া নিয়েছিল দুটো ঘরের চারশো টাকা। তুষার এখন অনন্তলোকে, কিন্তু আমার মতো অনেকের মনের গভীরে ওর স্থান।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া এবং একটু বিশ্রাম নিয়ে প্রায় ৫০০ ফুট নিচে নেমে কমলা বাগানে পৌঁছলাম। উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ি নদী। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট জনপদ— তাদের বাড়িঘর। মনে হয় স্বপ্নপুরী। সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফেরা। এদিন একটু বেশি পরিশ্রম হয়েছিল।

পরদিন সকালে প্রায় তিন কিলোমিটার ট্রেক করে সুনতালে খোলা। পাহাড়ের বুকে কয়েকটি কটেজ। একটি ঝোলনা ব্রিজ। তার নিরন্তর ঝরঝর আওয়াজ তুলে পাহাড়ি ঝরনা সুনতালে খোলার বয়ে যাওয়া। দারুণ দৃশ্য এখানে অতিথিদের জন্য রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা আছে। পুরী-তরকারী সহযোগে প্রাতরাশ সেরে একই পথে ফিরে আসা। তবে আমার বয়স্ক দুই দাদার একটু অসুবিধে হয়েছিল। দুপুরে খাওয়াদাওয়া এবং একটু বিশ্রাম নিয়ে প্রায় ৫০০ ফুট নিচে নেমে কমলা বাগানে পৌঁছলাম। উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ি নদী। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট জনপদ— তাদের বাড়িঘর। মনে হয় স্বপ্নপুরী। সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফেরা। এদিন একটু বেশি পরিশ্রম হয়েছিল। এখানে ডিনার রাত ৮টায়। টিভিতে খবর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া। ভোরে মুরগির সঙ্গে অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির— গায়ে শীত মেখে বারান্দায় দাঁড়ালাম। তখন হালকা কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। ভোর পাঁচটা। একে একে মৃণালদা, বুড়োদা ও স্যাটা এসে দাঁড়ায়। সকাল ১০টায় আমরা শেয়ার জিপে মালবাজার যাব।

রেডি হয়ে শুধু রুটি ও আলুভাজা ও লাল চা খেয়ে নিচে নামতেই দেখি আমাদের নিতে জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে। পথে বহু জায়গায় দাঁড়ানো হল। অনেক ছবি তোলা হল। আসলে সামসিং থেকে মেটেলি-চালসা হয়ে যে রাস্তা তা সত্যি অপরূপা। মালবাজার পৌঁছে বিশালাকার হনুমান মন্দির দর্শন করে পার্কে এলাম। ছোট্ট পার্ক, কিন্তু ছিমছাম। রোদের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণীদের ফিসফিসানি চলছিল। ভেতরে একটা ছোট কাফেটেরিয়া ছিল, খুব স্বল্প সম্ভার নিয়ে। সময় বয়ে যাচ্ছিল। আমরা এলাম মালবাজার বাসস্ট্যান্ডে বাপির হোটেলে। ছোট্ট হোটেল একসঙ্গে ২৪ জন বসে খেতে পারে। দারুণ বাঙালি রান্না। দামও সাধ্যের মধ্যে। এবার আমরা ওই জিপ গাড়িতেই রওয়ানা হলাম অপূর্ব নৈসর্গিক চিত্র সম্বলিত স্বপ্নপথে— ডামডিম, ওদলাবাড়ি, বাগরাকোট, বাঘপুল-সেভেক, সেভক বাজার হয়ে নিউজলপাইগুড়ির পথে। এ রাস্তার সৌন্দর্য্য কথায় প্রকাশ করতে লাগসই শব্দ অপ্রতুল মনে হয়। ওদলাবাড়ি ছাড়তেই লামার হোটেল। ডুয়ার্সের সবচেয়ে পুরানো লাইন হোটেল। বর্তমানে তৃতীয় প্রজন্মের হাতে পরিচালনা। লামাজির পুত্রের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে যাত্রা। ওয়াসাবাড়ির কাছে ডাইনে নীল পাহাড়, বিস্তীর্ণ পাহাড়ি নদীর বালুরেখা, দূরে চা বাগিচার ছায়াবৃক্ষের সারি— মন কেড়ে নেয়। এই অঞ্চলটায় কেন যে রিসর্ট তৈরি হয় না?

সামনের পাহাড়, জঙ্গল, পাখির কলকাকলী, শাখামুগের দুষ্টামী দেখতে দেখতে করোনেশন ব্রিজ। তিস্তা নদীর দু'পার জুড়েছে। অর্দ্ধগোলাকার আর্চের উপর পিলারহীন সেতু এলাকার মানুষ বলে বাঘপুল। ওই সেতু পার হওয়ার পথে দুটো জলপ্রপাত অতিক্রম করেছিলাম। ওরা সেভক কালীবাড়ি দর্শন করে একটু দেরীতেই নিচে লামল। এবার সেভক বাজারে গৌতম হোটেলের টেরাসে বসে চা পান। দূরে তিস্তার বুকে সন্ধ্যা নামছিল। ঝমঝম শব্দ তুলে ট্রেন যাচ্ছে সেভক, গুলমা স্টেশন হয়ে শিলিগুড়ি জংশন। অন্ধকার ঘনায়। কিছুটা বন অতিক্রম করে ফৌজিদের আস্তানার পাশ দিয়ে শিলিগুড়ি ছুঁয়ে পৌঁছলাম এনজেপি-তে। রাত আটটায় দার্জিলিং মেল। জিপ গাড়ির ড্রাইভার কিশোর নামে যুবক একটু চুপচাপ। কিন্তু রাস্তায় মেহেদি হাসান, গুলাম আলি-র গান শুনিয়েছিল। রাতের আহার সঙ্গে দিয়ে ওদের ট্রেনে তুলে দিয়েছিলাম। কিশোর আমাকে জলপাইগুড়ি ছেড়ে সামসিং ফিরে যায়।

কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল

কোচবিহারের সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি সাহসী উদ্যোগ নিয়েছেন এই হেরিটেজ শহরের এমন একটি নাট্যসংস্থা যাঁদের এখনও পর্যন্ত কোনওরকম সরকারি অনুদান মেলে না। কিন্তু তাই বলে তো সরকারের নৈতিক সমর্থন থাকবে না। এমনটা হতে পারে না!

সে জন্যই আগামী অক্টোবরের ২৬ থেকে ২৯ কোচবিহার রবীন্দ্র সদনে
কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ আয়োজিত 'কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল'কে সফল করে তুলতে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী এবং কোচবিহার পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান ভূষণ সিং।

সম্প্রতি আয়োজকদের এর প্রেস বৈঠকে হাজির থেকে তাঁরা দু'জনেই এই বার্তা দিয়েছেন। এই ফেস্টিভ্যালের উপদেষ্টা কমিটিতে এঁরা দু'জন ছাড়াও আছেন বর্ষীয়ান গবেষক নৃপেন্দ্রনাথ পাল ও কবি রণজিৎ দেব, সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য, দুই চিকিৎসক কমলেশ সরকার ও ইন্দ্রজিত নাথ প্রমুখ শহরের বিশিষ্ট নাগরিকেরা।

সংস্থার পক্ষ থেকে পূর্বাচল দাশগুপ্ত জানালেন, উত্তরবঙ্গের পরিচিত গ্রুপগুলি ছাড়াও এই ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত দল হিসাবে যোগ দেবেন দুটি জনপ্রিয় থিয়েটার গ্রুপ কলকাতার 'চার্বাক' ও বাংলাদেশের 'ঢাকা বটতলা'।

ফেস্টিভ্যালের সিজন টিকিট পাওয়া যাচ্ছে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের 'এলিট' শোরুমে এবং জলপাইগুড়িতে 'আড্ডাঘর'-এ।

এই ফেস্টিভ্যালের প্রচার ও প্রকাশনা সহযোগী হিসেবে যোগ দিয়েছে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা। পত্রিকার উদ্যোগেই উদ্বোধনের দিন প্রকাশিত হবে একটি মূল্যবান স্মারক সংকলন, যেটি টিকিট কাটলেই পেতে পারেন বিনামূল্যে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

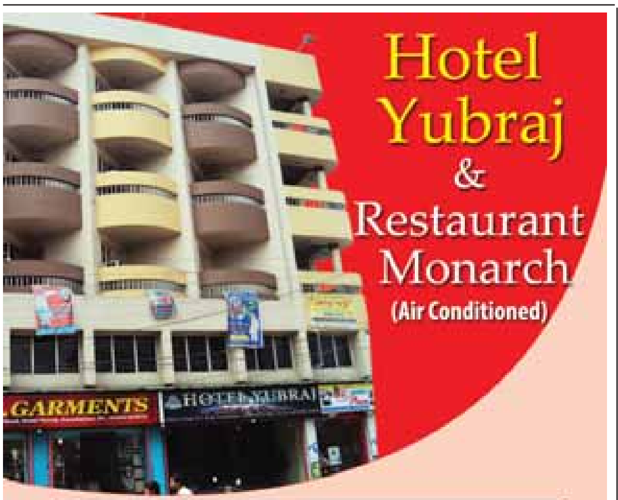

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর

স্কুলেই আমরা ক্রেতা অধিকার শিখেছি
টাকা জমা রাখার আগে খবর নিতে হয়

ওয়েবসাইট ঃ www.wbconsumers.gov.in

Consumer Helpline : 1800-345-2808 (TOLL FREE)

সহ-অধিকর্তা - উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার
জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্য্যালয় জেলা প্রশাসনিক ভবন, তৃতীয় তল, রুম নং - ৭, জলপাইগুড়ি
দূরভাষ ঃ ০৩৫৬১ - ২২৫৭৬৪

বাংলা ১৪২৪ সনের শারদীয়া উৎসবের
প্রাক্কালে সমস্ত মানুষের মঙ্গল প্রার্থনা করে

বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড

राष्ट्रीय पुरस्कार 2013-2014

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए
श्री बिस्वाजीत पोद्दार (पीएमईजीपी)
को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

NATIONAL AWARD 2013-2014

conferred to

Shri Biswajit Poddar (PMEGP)

for Excellence in the field of Khadi and Village Industries

उषा सुरेश
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Usha Suresh
Chief Executive Officer

Khadi India
Khadi and Village Industries Commission
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
Government of India

विनय कुमार सक्सेना
अध्यक्ष
Vinai Kumar Saxena
Chairman

গহনা তৈরির জন্য গত বছর মিলেছে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (২০১৩-২০১৪ সালের জন্য)। যা এক কথায় বিরাট সম্মান। এছাড়াও রয়েছে নানা প্রশংসা ও স্বীকৃতি। শোরুমে মনকাড়া ডিজাইনের পাশাপাশি কর্মীদের সুন্দর ব্যবহার আপনাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানেরই একজন করে তুলতে বাধ্য।

P.M.E.G.P. Unit
under K.V.I.C.,
Govt. of India

B. PODDER MICRO GOLD

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

স্বল্প পুঁজিতে ঘরে বসে ব্যবসায়ে ইচ্ছুকরা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

R. N. Road, Dakshinayan Building 2nd Floor, Cooch Behar, Pin - 736101 (W.B.)

Phone: 03582-228597, 98320 92714, 8967863754 E-mail: bpmicrogold@gmail.com

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

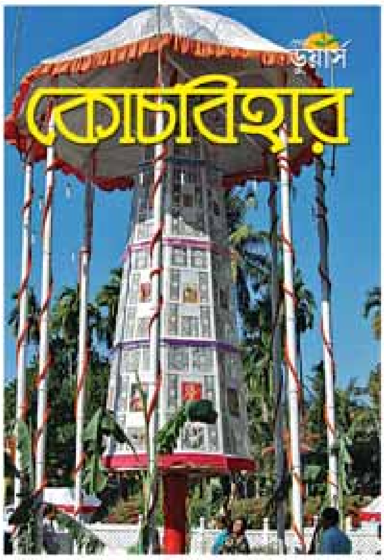

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

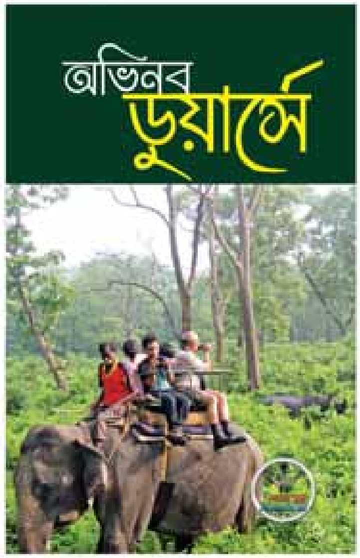

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

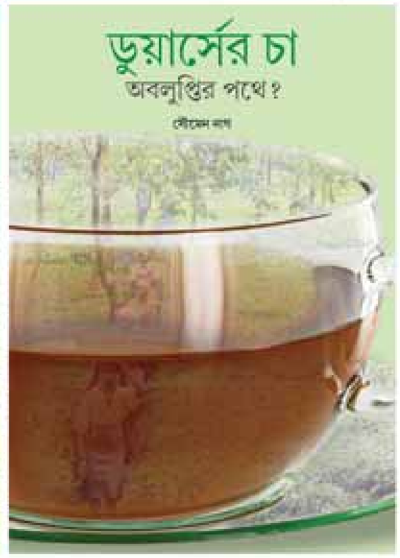

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

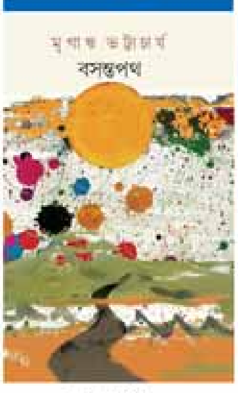

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

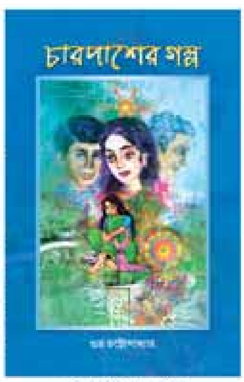

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

সমকালীন কাহিনি

মেঘের পর রোদ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

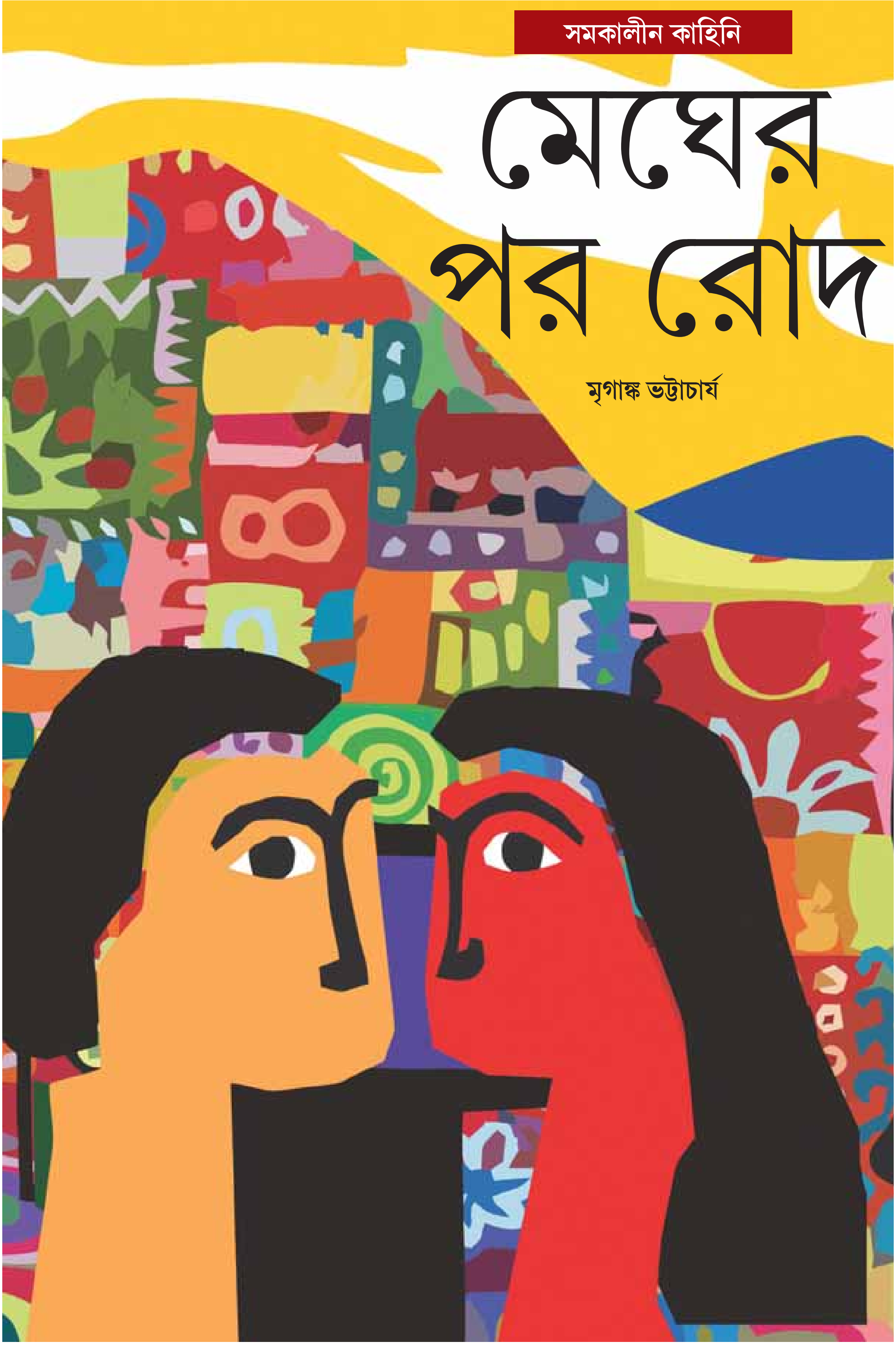

১

চেককাটা লুঙ্গি আর ময়লা গেঞ্জি পরা লোকটা হৈচৈ জুড়ে দিয়েছে হাসপাতাল কম্পাউন্ডে। বিস্ফারিত চোখ, মুখ শুকনো, হাঁফাচ্ছে। উত্তেজিত গলায় বলল, আমার বউকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।

দুশো পাওয়ারের বালব জ্বলছে আউটডোরের ঘরে। হলদে আলোতে একটা কাঠের চেয়ারে শ্রান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে রঘুবীর খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো দেখছিল। সারাদিন কাগজ দেখার সময় হয়নি। গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তারের কি আর কাগজ পড়ার বিলাসিতা মানায়!

অন্য দিনের মতো আজও একটা ব্যস্ত দিন গেছে। রুগির স্রোত ছিল সারাদিন ধরে। ডাইরিয়া, জ্বর, পেটে ব্যথা, স্ট্রোক, শ্বাসকষ্ট, ডেলিভারি ..। কোমর বেশ টনটন করছে সারাদিনের দৌড়ঝাঁপে। লোকটাকে দেখে কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রঘুবীর। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী হয়েছে ?

- সাপে কামড়েছে ডাক্তারবাবু। লোকটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, সন্ধেবেলা পুকুরে বাসন মেজে আমার বউ বাড়ি ফিরছিল। সাপটা পথের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। পায়ের গোছে কামড়ে দিয়েছে।

- আপনার বউ কি দেখেছে সাপটাকে?

লোকটা হুড়মুড় করে বলল, ও বুঝতে পারেনি। সাপটা ছোবল দিয়েই পালিয়ে গেছে। আমি বাইরে ছিলাম। খবর পেয়ে বাড়ি গিয়ে যেখানে সাপটা কামড়েছে সে জায়গাটা সাবান দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিলাম। সাপের বিষ যাতে মাথায় না উঠে পড়ে সেজন্য শক্ত করে বাঁধনও দিয়ে দিয়েছি। সময় নষ্ট না করে সাইকেল ভ্যানে চাপিয়ে ওকে নিয়ে এসেছি হাসপাতালে।

পেশেন্টের পায়ের গোড়ালির কাছটা দেখল রঘুবীর। নীল হয়ে রয়েছে। ফুলেও গেছে অনেকটা।

রঘুবীর একটা শ্বাস ফেলল। সাপের কামড়ের জন্য নয়, জায়গাটা ফুলে রয়েছে শক্ত বাঁধনের জন্য। এভাবে রক্ত চলাচল বেশ কিছুক্ষণ ধরে বন্ধ হয়ে থাকলে গ্যাংগ্রিন হবার সম্ভবনা থাকে। তখন পা কেটে বাদ দিতে হতে পারে। এত বিজ্ঞান সচেতনতা শিবির হয় তার পরেও সাপের কামড়ে বাঁধন দিলে যে লাভ হয় না, উল্টে ক্ষতি হতে পারে সেটা কম লোক বোঝে। মস্তিস্কে এতদিন ধরে গেঁথে রয়েছে যে কুসংস্কার সেটাকে বিদায় করা সহজ নয়। তাছাড়া শহরের মানুষই বোঝে না গ্রামের লোকজন কী করে বুঝবে!

সিরিঞ্জ দিয়ে খানিকটা রক্ত টানল রঘুবীর। রক্ত জমাট বাঁধছে। বিষের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তার মানে সাপটা নির্বিষ ছিল। নব্বই শতাংশ সাপই তো আসলে বিষহীন। নির্বিষ সাপের কামড়ে তো ক্ষতি হয় না কোনও। যেটা হয় সেটা প্যানিক অ্যাটাক। বিষাক্ত সাপের কামড়ের কেস যে এই হাসপাতালে আসে না তা নয়। এক আধটা আসে। সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে অ্যান্টি ভেনম দিতে হয়। রঘুবীর এই হাসপাতালে আসার পর এ তল্লাটের কেউ সাপের কামড়ে মারা যায়নি।

মহিলার চোখমুখ আতংকে শুকনো হয়ে রয়েছে। প্রচন্ড নার্ভাস হয়ে আছে চেক লুঙ্গি পরা লোকটাও।

রঘুবীর আশ্বাস দিয়ে বলল, ভয়ের কিছু নেই। তবে আজ রাতটা এখানে ভর্তি থাক। হাসপাতালের কেয়ারে থাকলে ভালই হবে। তবে এখানে বেড খালি নেই। আমাদের বাধ্য হয়ে মেঝেতেই পেশেন্টকে রাখতে হবে।

লোকটার মুখে হাসি ফুটল, পেশেন্টকে বারান্দায় রাখলেও আমার আপত্তি নেই।

নার্সের দিকে তাকিয়ে রঘুবীর মুখের একটা করুণ ভঙ্গি করে বলল, অনেক রাত হল। সেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে, আমার শরীর আর দিচ্ছে না। খিদেও পেয়েছে জোর। আমি কোয়ার্টারে যাচ্ছি। এমনিতে কোনও চান্স নেই তবুও যদি পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় বা ইউরিন দিয়ে রক্ত আসে তাহলে আমাকে একটু ইনফর্ম করবেন।

এই গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে অসম আর ভুটান সীমান্ত হাতের একেবারে কাছে। এটা রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রাম হলেও আদিবাসী লোকজনও আছে প্রচুর। বাঙালি তো বটেই সেই সঙ্গে রাভা, মেচ, অসমিয়া সব রকম মানুষের বাস এই গ্রামে। কিছুদিন আগেও জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল ছিল এদিকটা। পুলিশের তাড়া খেয়ে গেরস্ত বাড়িতে গিয়ে জঙ্গিদের দু'-চারজনের ছোট ছোট দল রাত কাটিয়েছে অনেকবার। সকাল হলে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এখন আগের মতো সেই উপদ্রব নেই কিন্তু তলে তলে তাদের গোপন সংগঠন যে কাজ করে চলেছে সেটা আঁচ করতে পারা যায়।

এলাকার ত্রিসীমানার মধ্যে কোনও নার্সিং হোম নেই। এখানকার মানুষজনের বিপদে একমাত্র ভরসাস্থল এই গ্রামীণ হাসপাতাল। জেলা হাসপাতালে যাবার রাস্তার দশা অত্যন্ত খারাপ। এখান থেকে রেফার করা বহু কেস সদরে নিয়ে যাবার সময় রাস্তাতেই খারাপ হয়ে গেছে। তাছাড়া জেলা হাসপাতালে গেলেই যে আহামরি চিকিৎসা পাওয়া যাবে তা নয়। সেখানেও আছে দালাল চক্র। হাসপাতালের ডাক্তাররা সকলেই যে খুব দয়াবান তাও নয়। গ্রামের অশিক্ষিত লোকেদের খুব একটা পাত্তা পায় না সেখানে। কাজেই পেশেন্ট পার্টি কিছুতেই বাইরে যেতে চায় না।

রঘুবীর ছাড়াও আরও একজন ডাক্তার আছে এই হাসপাতালে। সোমনাথ পাল। কলকাতার ছেলে, শোভাবাজারে বাড়ি। চাকরি পাবার পর প্রথম পোস্টিং এখানে। বয়স বেশি নয়। সে এখন প্রেম-টেম করছে বোধ হয়। হরবখত ফোন আসে। পেশেন্ট ফেলে রেখে আড়ালে গিয়ে কথা বলতে থাকে তো বলতেই থাকে। কিছুদিন পর পর 'একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি' বলে চলে যায় কলকাতায়। ফলে রঘুবীরকে একা হাতে চালাতে হয় এই হাসপাতাল।

নিছক সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গন্ডগ্রামে আসেনি রঘুবীর। এই গ্রামীণ হাসপাতালে তার আসার পেছনে অন্য কারণ আছে। ডাক্তারি পাশ করে বেরোবার পর রঘুবীর আরএমও হয়ে ঢুকেছিল একটা নার্সিং হোমে। কিন্তু বেশিদিন চাকরি করতে পারেনি। ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে খটাখটি লাগতে শুরু করল কিছুদিন পর থেকেই। রঘুবীর যে সাংঘাতিক রকম আদর্শবাদী তা নয়। তারও আর পাঁচটা মানুষের মতো লোভ, লালসা ইত্যাদি আছে। কিন্তু একেবারে বিবেকহীন রক্তচোষা সে নয়। সেই বিবেক নামক অদৃশ্য বস্তুটির দংশনে কিছুদিনের মধ্যেই তার রাতের ঘুমের দফা রফা শুরু হয়ে গেল।

নার্সিং হোমে তার ডিউটি ছিল তিন ঘন্টা করে। তার মধ্যেই দেখতে পেত কীভাবে নিরীহ অশিক্ষিত পেশেন্টদের চুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। কোনও কারণ ছাড়াই পেশেন্টকে ঢুকিয়ে দেওয়া হত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। অপ্রয়োজনে গরিব লোকগুলোর নানা রকম প্যাথলজি টেস্ট

করানো হত। নার্সিং হোমে প্রিয়জনকে অ্যাডমিট করিয়ে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে ঘটিবাটি বেচতে রাজি থাকে অসহায় মানুষ। সেটাকেই হাতিয়ার করে কিছু অসাধু লোক। এসব দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল রঘুবীর। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, বড় ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক হত কথায় কথায়। ফলে এই চাকরি তাকে ছাড়তে হয়।

তারপর সরকারি চাকরি নিয়ে নিয়েছিল রঘুবীর। রাজনীতির রং তার পছন্দ নয়। কোনও সংগঠনে নাম লেখায়নি রঘুবীর। তার প্রয়োজনও বোধ করেনি। হয়তো সে কারণে রঘুবীরের জেলা হাসপাতালে কখনও আসা হয়নি। গ্রামীণ হাসপাতালে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামীণ হাসপাতালে যেমন সে রয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে।

রঘুবীর আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো নয়। কেউ কখনও শুনেছে যে মেডিক্যাল কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র কখনও গ্রামে পড়ে থেকে এভাবে কেরিয়ারটাকে নষ্ট করে! রঘুবীরের মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুরা পড়াশোনা চালিয়ে গিয়ে এমডি করে এখন প্র্যাকটিস জমিয়ে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনে। বড় বড় নার্সিং হোমের সঙ্গে তারা যুক্ত। পশ জায়গায় থ্রি বিএইচকে বা ফোর বিএইচকে ফ্ল্যাট হাঁকিয়েছে, নতুন মডেলের বিশাল গাড়ি কিনেছে, বছরে দু'বার করে ফ্যামিলি নিয়ে কন্টিনেন্ট ট্যুর করে তারা। রঘুবীরও ইচ্ছে করলে তেমন একটা জীবন কাটাতে পারত। যে কোনও নার্সিং হোম রঘুবীর মিশ্রের মতো একজন ডাক্তারকে পেলে লুফে নিত। অথচ রঘুবীর সে পথে হাঁটল না।

টিপলু এসব দেখেই প্রেমে পড়েছিল রঘুবীরের। এমন সৎ, কর্মঠ, সংবেদনশীল একজন মানুষ আজকাল কোথায় মেলে? বিয়ের আগে তাদের দু'বছরের প্রেম। তারপর বিয়ে। বিয়ের পর বাবুসোনা এল। বেচারা টিপলু। তাকে নাকানি চোবানি খেয়ে একা হাতে ছেলেকে মানুষ করতে হয়। সংসারের খুঁটিনাটি, বাজার হাট থেকে ছেলের পড়াশোনা - সব সামলায় টিপলু। রঘুবীর তেমন একটা সময় দিতে পারে না বাড়িতে।

রঘুবীর ছুটিছাটায় বাড়িতে এলে টিপলু রাগের মাথায় অনেক কথা শোনায় রঘুবীরকে। ছেলের দায়িত্ব বউয়ের কাঁধে চাপিয়ে রঘুবীর যে দেশ উদ্ধার করছে আর সেটা করতে গিয়ে টিপলুর জীবন, ছেলের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে সেটা নিয়ে যা মুখে আসে তাই শোনায় স্বামীকে।

কিন্তু রাগ পড়ে গেলে রঘুবীরের বুকের কাছে ঘন হয়ে আসে টিপলু। তিক্ততার উল্টো পিঠেই তো আছে ভালবাসার বহমান নদী। নির্লোভ সংবেদনশীল এমন একটা বাউন্ডুলে মানুষকে কি ভাল না বেসে পারা যায়!

কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে রঘুবীর। পোশাক বদলে একটা টি শার্ট আর বারমুডা পরে নিল। এবার একটু স্বস্তি এল যেন। টিপলুকে ফোন করে বলল, বাবুসোনা কোথায়?

টিপলু রেগে মেগে বলল, এতক্ষণে ফোন করার সময় হল! কত রাত হয়েছে সে খেয়াল আছে? তোমার ফোনের জন্য বসে থাকলে তো ওর চলবে না। কাল ভোরে উঠে ওকে স্কুল যেতে হবে। বাবুসোনা অনেকক্ষণ আগে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রঘুবীর হাসল, বাবুসোনার মা কী করছে?

টিপলু ছদ্ম কোপ দেখিয়ে বলল, টিভি সিরিয়াল গেলার অভ্যেস তো আর তার নেই। খেলাতেও তার ইন্টারেস্ট নেই। সে তো আর সারাদিন দম ফেলার সময় পায়নি। এখন একটু অবসর পেয়েছে। এখন সে গল্পের বই পড়ছে।

- কী বই?

- ইংরেজি ফিকশন। মেডিক্যাল সায়েন্স সংক্রান্ত কোনও বই নয়।

- তুমি সব সময় এত রেগে থাকো কেন বলো তো! রঘুবীর হেসে উঠেছে।

- সংসারের দায় বউয়ের ওপর চাপিয়ে স্বামী গ্রামে পড়ে থেকে দেশ উদ্ধার করছে। বউ রাগবে কেন তার তো আনন্দে দু'হাত তুলে নৃত্য করার কথা!

রঘুবীর হাসল, তোমার কষ্ট কি আর আমি বুঝি না নাকি। শোনো না, তোমার এই বোরডম থেকে মুক্তির জন্য একটা ব্যবস্থা করেছি। সামনের মাসে আমরা লেহ লাদাখ যাচ্ছি ঘুরতে।

- মানে? টিপলু বিস্মিত।

- ইয়েস ম্যাম। ট্র্যাভেল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিছুদিন আগে। আজ বিকেলেই কনফার্ম করেছে ওরা।

- হাসপাতাল সামলাবে কে? দু'-চারদিন তো নয় বেশ কয়েকদিনের ব্যাপার। তোমার ছুটি স্যাংশন করবে?

- দু'সপ্তাহের ছুটির ব্যবস্থা করে নিয়েছি। সোমনাথের সঙ্গেও কথা হয়েছে। ও নিজেই বলেছে এই ক'দিনের হ্যাপা ও সামলাবে। এবার বলো আমায়, আর ইউ হ্যাপি?

টিপলুর মুখে একটা হাসি খেলে গেল। ফোনটা কান থেকে সরিয়ে চোখের সামনে এনে ধরেছে। দুই ঠোঁট জড়ো করে একটা আওয়াজ করল টিপলু। তারপর বলল, সেটা এখন বলব না। তুমি বাড়িতে এলে বলব!

২

এ এক অন্য পৃথিবী। জঙ্গলের সোঁদা গন্ধ নিতে নিতে, জংলা ফুলের বাহার দেখতে দেখতে, পথের মোড়ে জটলা করা মানুষজনের সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে কীভাবে যে সময় কেটে যায় বোঝাই যায় না।

ছোটবেলা থেকে এই অপরূপ প্রকৃতি দেখে আসছে গ্রেগরি। তবুও মনে হয় দেখা আর ফুরোয় না। যেন দূরের কোনও অতীত থেকে এই পাহাড়ি গ্রাম ছিটকে এসে পড়েছে পৃথিবীতে।

হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে আসছিল গ্রেগরি। একদল ছেলে গরু মোষ চরাতে এসেছে। ফর্সামতো এক ছেলেকে কী কারণে যেন খ্যাপাচ্ছে তার বন্ধুরা। ছেলেটি প্রথমে রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করছিল। এখন নিজেও যোগ দিয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে। লাজুক লাজুক মুখ করে হাসছে।

শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। কুয়াশা ভেসে ভেসে আসছে কোত্থেকে। আড়াল করে দিচ্ছ দৃষ্টিপথ। পায়ে হাঁটা রাস্তাটা যেন ক্রমশ নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। চামড়ার একটা জ্যাকেট পরেও শীত বাগে আসছে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে। সোনালি রং বদলে যাচ্ছে মেহগিনি রংয়ের দিকে। স্নিগ্ধ আলো বিছিয়ে আছে পাহাড়ি উপত্যকায়।

দূর পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘের জটলা। বাঁশঝাড় থেকে একদল টিয়া উড়ে গেল ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে। অগুন্তি ছোট থেকে মাঝারি আকারের পাখি নিজের নিজের বাসার দিকে ফিরে আসছে ডানা ঝাপটে।

রাস্তার ধারে সবজি নিয়ে বসেছে এক কিশোরী আর তার

বাবা। কিশোরীর বাবার নাম ভাইলা। গ্রেগরির বাবা ভিভিয়ানের দাবা খেলার বন্ধু। ভাইলা সবজি কিনছিল। স্কোয়াশ আর আলু বড় একটা থলের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে নেপালিতে জিজ্ঞেস করল, আজ স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরি হল?

- চকবাজারে একটা মিটিং ছিল দুপুরে। স্কুল থেকে সরাসরি ওখানে গিয়েছিলাম। গ্রেগরি উত্তর দিল।

ভাইলা জানতে চাইল, লোক হয়েছিল?

গ্রেগরি মাথা নেড়ে বলল, বেশ অনেক অনেক লোক হয়েছিল মিটিংয়ে। এই পাহাড়ের নাম করা সব লিডার ছিল। দাওয়াইপানির রোহিত থাপাও ছিল। রোহিতও ভাষণ দিল। তুমি কী করছ? হোটেলের জন্য সবজি কিনছ বুঝি?

- হ্যাঁ রে আনাজপাতি সব দেখলাম ফুরিয়ে গেছে। এখন দুম করে যদি কোনও খদ্দের এসে পড়ে তাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে। তাই ভাবলাম সামনেই যখন বাপ-বেটি বসেছে সবজি নিয়ে তাহলে কিছু কিনে রাখি। হাসল ভাইলা।

হাসিটা ফিরিয়ে দিল গ্রেগরি। হোটেল চালানো ভাইলার একটা বাহানা। একসময় বাস চালাত। এখন আর পারে না। ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেছে। একজন দেওরালিতে থাকে, অন্যজন রিম্বিকে। মাসে মাসে টাকা পাঠায় বাবাকে। ভাইলার টাকার যে খুব দরকার আছে তা নয়। কিন্তু বউ মারা যাবার পর সময় কাটানর জন্য কিছু একটা করা দরকার তাই হোটেল খুলেছে।

গ্রেগরির বউ রজনীগন্ধার ইদানিং বাই চেপেছে হোটেলের ব্যবসা খোলার। ভাইলার মতো অপরিচ্ছন্ন ঘরদোর তার পছন্দ নয়। ভদ্রলোক থাকতে পারে না ওখানে। দাওয়াপানির যতীন রাই আগে চাষবাস করত। যতীন কিছুদিন হল খুলেছে হোম-স্টে সার্ভিস। খবর ছড়াতে শুরু করেছে। টুকটাক আসছে লোকজন। আসলে এদিকে তেমন একটা ট্যুরিস্ট আসে না। কিন্তু এদিকের সৌন্দর্যের কথা পর্যটন দপ্তর যদি একটু তুলে ধরে তাহলে কিন্তু লোক আসবে।

রজনীগন্ধা দার্জিলিংয়ের মেয়ে। শহুরে মেয়েরা যেমন হয়, বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বা অন্তত ম্যালের বেঞ্চে বসেও সময় কেটে যেত রজনীগন্ধার। কিন্তু দাওয়াইপানিতে বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে ভীষণ বোর হচ্ছে রজনীগন্ধা। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না আর। একমাত্র গ্রেগরি ছাড়া মনের কথা বলার লোক নেই। নিজেকে কোনও কাজে ব্যস্ত রাখতে না পারলে এই একাকিত্ব কাটবে না। সেজন্য রজনীগন্ধা খুব করে ধরেছে গ্রেগরিকে। তাদের দোতলা কাঠের বাড়ির ওপরতলাটায় হোম-স্টে সার্ভিসের জন্য। গ্রেগরির আপত্তি ছিল না। পড়াশোনা জানা পুত্রবধু স্কুলে পড়াক ঠিক আছে কিন্তু হোম-স্টে ব্যবসা করবে এটা ভিভিয়ানের পছন্দ নয়। হোটেল খুললেই তো কত রকম মোদো মাতাল ট্যুরিস্ট এসে উঠবে। রজনীগন্ধা কী করে সামলাবে সে সব ঝামেলা!

গ্রেগরিকে বলেছে ভিভিয়ান, তাদের টাকা পয়সার তেমন একটা অভাব নেই। দাওয়াপানিতে ভিভিয়ানের সামান্য খেতিজমি আছে। গোয়ালে গরু আছে কয়েকটা। বেডফোর্ডের ট্রাকে করে ওদের বাড়ি থেকে প্রতিদিন ঠিকাদারেরা দুধ নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয় দার্জিলিংয়ে। বড়লোক না হলেও বলতে গেলে মোটামুটি সচ্ছল পরিবার। আগে একটা স্কুলে পড়াত ভিভিয়ান। রিটায়ার করেছে বছরখানেক আগে। তার জায়গায় ওই স্কুলে চাকরি পেয়েছে গ্রেগরি। এই পাহাড়ে এটাই দস্তুর।

ভাইলা সবজির দাম মিটিয়ে দিতে দিতে বলল, তোর সঙ্গে কথা আছে। ঘড়ি দেখার দরকার নেই। দশ মিনিটের বেশি সময় নেব না।

কাঠের নড়বড়ে দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয়। দশ বাই দশের ঘর। একটা চৌকি। পাহাড়মুখি একটা পরদা দেওয়া জানলা। অন্য দরজার ওপারে রান্নাঘর। টয়লেট নিচে, বাড়ি থেকে চার কদম দূরে। নিচের তলায় গরুর খোঁয়াড়। তাকের ওপর রাখা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি বুদ্ধের এক অপূর্ব মূর্তি।

ভাইলার হোটেলে অদ্ভুত নিয়ম। দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে না। রাতে ভরপেট খাবার পাওয়া যাবে। যতবার খুশি চা খাওয়া যাবে। চা ফ্রিতে পাওয়া যাবে। পাশে ছোট্ট মতো একটা ঘর খোলা আছে। একজন মানুষের বেশি সে ঘরে আঁটা মুশকিল। হোটেল খালিই পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়।

ভাইলা বলল, রোহিত কাল রাতে আমার কাছে এসে বলে গিয়েছিল আজ চক বাজারের মিটিংয়ে যাবার জন্য। কয়েকটা কাজ ছিল বলে যেতে পারিনি। মিটিংয়ে রোহিত কী বলল রে?

গ্রেগরি বলল, সামনের সপ্তাহ থেকে আন্দোলন আরও জোরদার হবে। দার্জিলিং সীমান্তের একটা গ্রামে জমায়েত আছে এ মাসের শেষে। সেখানে যাবার জন্য ফরমান দিয়েছে লিডাররা। গোর্খারা তো সেই জমায়েতে যোগ দেবেই, লেপচারাও থাকবে। পাহাড়ে যত বাঙালি-মারোয়াড়ি-বিহারি-আদিবাসি আছে তাদেরকেও বলে দিয়েছে ওখানে যাবার জন্য।

ভাইলা একটু হাসল। তারপর বলল, 'জমায়েত' শব্দটা বেশ লাগে আমার। এই শব্দটা দার্জিলিংয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে রয়েছে।

- কীরকম?

- লেপচাদের উপজাতীয় ভাষায় 'তাজি লাং' মানে 'জমায়েত হয়ে আড্ডা দেওয়ার জায়গা'। ধীরে ধীরে 'তাজি লাং' লোকমুখে হয়ে গেল 'দোর্জে লিং'। তারও পরে

এখন ডুয়ার্স-এর নতুন বই

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো

সা গ রি কা রা য়

এক মায়াময় জগত ডুয়ার্স, যার সঙ্গে লেখিকার নাড়ীর বন্ধন। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চেতনার রঙে জারিত হয়ে ফুটে ওঠে ডুয়ার্সের নানা চিত্রকল্প। কলকাতার একটি বড় দৈনিকের রবিবারের পাতায় একসময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া চৌত্রিশটি গল্পের সংকলন।

প্রকাশিত হল। **দাম ১৫০ টাকা**

প্রাপ্তিস্থান: কলকাতা - দেজ পাবলিশিং ও অক্সফোর্ড। জলপাইগুড়ি - আড্ডাঘর, মার্চেন্ট রোড

ইউরোপের মানুষদের উচ্চারণে হল 'দার্জিলিং'। কিন্তু গপ্পোবাজ মানুষদের আড্ডা দেওয়ার এই শান্ত মেঘমুলুকে এমন দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠবে সেটা তারা জানত না। জানলে হয়তো অন্য কোনও নাম রাখত।

- হা হা হা এটা ভাল বলেছ। গ্রেগরি একগাল হেসে বলল, যাক গে শোনো, মিটিংয়ের শেষে রোহিত থাপা আমাকে ডেকেছিল আলাদা করে। আমাদের গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে অন্তত দু'জন পুরুষকে যেতে বলে দিয়েছে। বাড়ির মেয়েদের জন্য অবশ্য নিয়ম আলাদা। ওরা ইচ্ছে করলে যেতে পারে, না-ও যেতে পারে।

ভাইলা হাসিটা মুখ থেকে মুছে ফেলল। ভাবছে কিছু একটা। চিন্তিত গলায় বলল, রোহিত পরশু এসেছিল আমার কাছে। ওকে বুঝিয়ে বললাম, আমার বয়স হয়েছে। শরীরটা ইদানিং ভাল যাচ্ছে না। মাথা চক্কর মারে মধ্যে মধ্যে। আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া মুশকিল। রোহিত রেগে গেল আমার কথা শুনে। গটগট করে চলে গেল পাথরের মতো মুখ করে। কী করি বল তো?

গ্রেগরি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, প্রোগ্রামটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে আন্দোলন দিন দিন জোরদার হচ্ছে। সেই সঙ্গে লোকজনের ইনভলভমেন্টও বাড়ছে। রোহিতের কথা ছাড়ো, তবে ঘটনা হল জমায়েতে না গেলে দার্জিলিংয়ের বড় লিডাররাও রেগে যাবে।

- তোর বাবা কি যাবে?

গ্রেগরি বলল, বাবাকে তো তুমি চেনো। বাবা এসবের মধ্যে নেই। তাছাড়া বয়সও হয়েছে। রিটায়ার করে গেছে। এখন আরাম করার সময়। বাবা এসব ঝুটঝামেলায় যেতে চায় না। বাবা যেতে চাইবে না নিজে থেকে। আমি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে বলব।

একটা শ্বাস ফেলে শুকনো মুখে ভাইলা বলল, এই বয়সে এসব আর ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে কি বাঁচা যায়!

৩

ওয়াহব ফোন করে জিজ্ঞেস করল, স্যার আপলোগ রেডি?

রঘুবীর জবাব দিল, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নিয়েছি আমরা। এখন চা খাচ্ছি। তুমি চলে এসো।

ওয়াহব বলল, পাঁচ মিনিট কে অন্দর হাম আ রহে হ্যায়।

ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে এল ওয়াহব। ত্রিশের কম হবে বয়স। পরনে জিনস আর কালো চামড়ার জ্যাকেট। গোলাপি গায়ের রং, আর্যসুলভ খাড়া নাক, উজ্জ্বল চোখের মণি। মাথায় কান ঢাকা চামড়ার টুপি।

জাইলো গাড়িটা লজের সামনে এনে দাঁড় করাল ওয়াহব। গাড়ি থেকে নেমে হেসে বলল, আজ ওয়েদার খুবসুরত হ্যায়। বহুত কুছ দেখনে কো মিলেগা।

ড্রাইভিং সিটে ওয়াহব। ওর পাশে বসেছে বাবুসোনা। ওয়াহবকে বলে রঘুবীর গাড়ি দাঁড় করাল এক জায়গায়।

গাড়ি থেকে নেমে ফোটো তোলা হচ্ছে। রঘুবীর আর টিপলু নিজের নিজের মোবাইলে কয়েকটা সেলফিও তুলে নিল। এমন চমৎকার নিসর্গ যে অগুনতি ফোটো তুলেও মনের সাধ মেটে না। মনে হয় প্রকৃতির এই অকৃপণ রূপের এক শতাংশও ক্যামেরাবন্দি করা গেল না।

ওয়াহব আর বাবুসোনা সামনে গেছে। একটু নিভৃতি পাওয়া গেছে। সাদা বরফের পাহাড়কে পেছনে রেখে মোবাইল ফোনে টিপলুর একটা ফোটো তুলল রঘুবীর।

টিপলু ভুরু তুলে বলল, ছবিটা কেমন হয়েছে দেখি?

রঘুবীর ফোনটা মজা করে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, দেখানো যাবে না। আমি যখন হাসপাতালে রাত জেগে ডিউটি করব তখন এটা দেখব চুপ চুপ করে।

- কেন?

- আমার বুকের বাঁদিকে এক সমুদ্র সুখের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক টুকরো গোপন ব্যথা। বউয়ের থেকে দূরে থাকার ব্যথা। বাইরে তো সেটা দেখাতে পারি না। হাসপাতালে যখন রাত জেগে রুগি দেখব তখন ইচ্ছে হলে সেই গোপন ব্যথাটাকে জাগিয়ে তুলব।

- বুকের বাঁদিকে ব্যথা যখন তাহলে ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার। তোমার কোনও কার্ডিওলজিস্ট বন্ধুর সঙ্গে একবার কনসাল্ট করো! টিপলু হি হি হাসছে।

একগাল হেসে গাড়ির পেছনের সিটে এসে বসল রঘুবীর। ওদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে এল টিপলু। ওয়াহব আর বাবুসোনা এসে বসেছে নিজের নিজের জায়গায়। চলতে শুরু করেছে গাড়ি।

টিপলু ডিটেকটিভ নভেলের পোকা। একটা পেপারব্যাক বই এনেছে। সেটাই পড়তে শুরু করল নিবিষ্ট হয়ে।

রঘুবীর উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। কাশ্মীরে এসেছিল বহু বছর আগে। কিন্তু লেহ লাদাখে এই প্রথমবার তার আসা। টিপলু ঘুরতে ভালবাসে কিন্তু এদিকে আগে আসেনি।

লেহ থেকে নুব্রা উপত্যকার উদ্দেশে এগোচ্ছে জাইলো গাড়িটা। দু'চোখ ভরে পথের সৌন্দর্যে অবগাহন করছে সকলে। রঘুবীর বলল, মোবাইলে জিপিআরএস দেখছি কাজ করছে না। নেটওয়ার্কে বোধ হয় সমস্যা আছে। আচ্ছা এই লেহ শহর থেকে খারদুং লা-র ডিসট্যান্স কত? এখন যেখানে আছি তার হাইটই বা কত?

ওয়াহব মুখ ফিরিয়ে বলল, উনচল্লিশ কিলোমিটার দূরত্ব। হাইট সাড়ে সতেরো হাজার ফিট। গাড়ি চলাচলের উপযোগী সবচেয়ে উঁচু রাস্তা বলে পরিচিত খারদুং লা। সেখান থেকে উত্তরে আরও পঁচাত্তর কিমি গেলে নুব্রা উপত্যকা। এই রাস্তা দিয়েই সিয়াচেনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য রসদ যায়। লাদাখের পর্যটকদের কাছে অবশ্য দর্শনীয় তালিকায় পড়ে নুব্রা।

খারদুং লা আসার পর রঘুবীর টিপলুর হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বলল, বেড়াতে এসে কেউ বই পড়ে! ওটা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দ্যাখো কী সুন্দর জায়গাটা!

টিপলু মুখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, সত্যিই তো! বরফে বরফে পুরো সাদা হয়ে রয়েছে গোটা এলাকা। স্বর্গের মতো লাগছে চারপাশ। এবার আমাদের প্ল্যান কী?

বাবুসোনা জবাব দিল, আমরা এবার খারদুং লা হয়ে নুব্রার দিকে যাব। ভাবতে পারছ কতটা উঁচুতে রয়েছি আমরা! আরও ওপরে উঠতে চলেছি এবার। একটাই প্রার্থনা, ওয়েদার যেন সঙ্গ দেয় আমাদের।

ওয়াহব হেসে বলল, আকাশ পরিস্কার আছে। ডোন্ট ওরি।

নিরাপদে পাস থেকে নেমে নুব্রার দিকে এগোচ্ছিল জাইলো

গাড়িটা। মাঝে একবার গাড়ি থেকে নেমে অপরূপ নিসর্গের ছবিও তোলা হল হৈ হৈ করে। তার একটুক্ষণ বাদে ঘটল সেই ঘটনা যা রঘুবীরদের চারজনের কল্পনাতেই ছিল না।

গাড়ি ড্রাইভ করছিল ওয়াহব। হঠাৎ অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল একবার। ওয়াহবের গলা শুনে সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল রঘুবীর।

বিরাট সাদা একটা পাহাড় প্রচন্ড গতিতে নেমে আসছে নিচের দিকে। গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে বা একটু সরে গিয়ে ওই সাদা পাহাড়টাকে এড়ানো সম্ভব নয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আদিগন্ত বিস্তার করা সাদা বরফ রাতারাতি গিলে ফেলল রঘুবীরদের গাড়িটাকে।

বিভ্রান্ত অবস্থা কাটতেই কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল। ততক্ষণে ওয়াহবের দু'পাশের জানলার কাচ ভেঙে গাড়ির ভিতরেও ঢুকে এসেছে বরফ। দরজা আটকে গেছে, গাড়ির মাথাতেও কয়েক ফুট বরফ জমে গেছে নিমেষে। ওয়াহব চিৎকার করে কিছু একটা বলল।

- কী হয়েছে ওয়াহব? রঘুবীর আতংকিত স্বরে বলল।

- তুষারধস স্যার। এক পাশে খাড়াই পাহাড়। অন্যদিকে খাদ। মধ্যিখানে সরু রাস্তা। সেই রাস্তার পুরোটাই গাড়ি সমেত চাপা পড়ে গেছে বরফের তলায়।

বিহ্বলতা কেটে সম্বিৎ ফিরেছে সকলের। কোনও রকমে গাড়ির আলো জ্বেলে প্রাণপণে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে ওয়াহব। 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সকলে। কিন্তু বরফের চাদর ভেদ করে কোনও আওয়াজ বাইরে যাচ্ছে না।

সবাই নিজের নিজের মোবাইল ফোন বার করে চেষ্টা করছে ফোন করার। লাভ হচ্ছে না। মোবাইল কানেকশন নেই। বাবুসোনা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, কী হবে এখন?

রঘুবীর ওয়াহবকে বলল, খারদুং লা পাস পেরিয়ে বড়জোর তিন কিলোমিটার এসেছি। এই সময় এখান দিয়ে তো অনেক গাড়িই যাতায়াত করার কথা। আমাদের চিৎকার কি কেউ শুনতে পাচ্ছে না?

টিপলু নার্ভাস গলায় বলল, আমার মনে হচ্ছে আমাদের গাড়িটার কাছাকাছি অন্য কোনও গাড়ি নেই। চাদর দিয়ে গাড়ি ঢেকে যাওয়ায় আমাদের চিৎকার বাইরে পৌঁছচ্ছে না।

ওয়াহব বলল, খারদুং লা পাস পৌঁছনর আগেই পুলিশের আউটপোস্ট ছিল একটা। প্রত্যেক গাড়ির নম্বর, ড্রাইভারের নম্বর, ড্রাইভারের পরিচয়পত্র এনট্রি করিয়েছি ওখানে। এটাই সিস্টেম। যে-সব গাড়ির নম্বর ওখানে এনট্রি হল নুব্রাতে সেই সব গাড়ি পৌঁছল কিনা তার খোঁজ করা হয়। টেনশন করবেন না ম্যাডাম। কেউ না কেউ আমাদের খোঁজ নিশ্চয়ই নেবে।

বাবুসোনা বলল, আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ওয়াহব প্রথমে একটু ঘাবড়ালেও ধীরে ধীরে নার্ভ ফিরে পাচ্ছে। রঘুবীরকে আশ্বস্ত করে বলল, এখন মাথা ঠান্ডা রাখুন স্যার। কোনও চিন্তা নেই। সাড়ে সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে সওয়ারিদের অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়। সেজন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকে এদিকের সব গাড়িতে। আমার গাড়িতেও আছে।

রঘুবীর বলল, একটা সিলিন্ডার দিয়ে কী হবে?

ওয়াহব বলল, একটাই যথেষ্ট। আমরা চারজন ওই সিলিন্ডার থেকে পালা করে করে অক্সিজেন নিলে ঘন্টা তিনেক সময় হাতে পাব। ততক্ষণে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে পালা করে করে শ্বাস নিচ্ছে সকলে। সময় কেটে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। অর্ধেক অক্সিজেন শেষ হতে চলল, কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হচ্ছে রেসকিউ টিমের কেউ বোধ হয় এল। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হচ্ছে না।

আড়াই ঘন্টা হয়ে গেল। অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নার্ভ ফেল করে গিয়েছে সকলের। আতংক গ্রাস করছে প্রত্যেককে। এমনকী ওয়াহব পর্যন্ত প্যানিক করতে শুরু করেছে এখন।

শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে বাবুসোনা আর টিপলু। ওয়াহব আর্ত চিৎকার করে উঠল একবার। লোকে বলে মরার সময় নাকি শৈশব থেকে যৌবন হয়ে বার্ধক্যের বিশেষ মুহূর্তগুলোর ঝলক একবার দেখে নেয় মানুষ। রঘুবীরের তেমন কিছু হল না। তীব্র উৎকণ্ঠা আর প্রবল আতংকের মধ্যে কখন যে জ্ঞান হারাল সেটা রঘুবীর জানে না।

রঘুবীরের জ্ঞান ফিরে এল সেনা ছাউনিতে।

তাকে ঘিরে সবুজ অ্যাপ্রন পরা জনা চারেক ডাক্তার আর কিছু সেনা অফিসারের ভিড়। একজন উদ্বিগ্নমুখে বললেন, আর ইউ ওকে?

ঠোঁট কাঁপল একটু। স্খলিত স্বরে রঘুবীর একটা কথাই শুধু বলতে পারল, আমি কোথায়?

রঘুবীরের কবজি ধরে পালস দেখছিলেন একজন ডাক্তার। বললেন, আপনি লেহ্-র সোনম নরবু মেমোরিয়াল হাসপাতালে। ইউ আর আউট অফ ডেঞ্জার নাও।

রঘুবীর আর্ত স্বরে বলল, আমার মিসেস কোথায়? আমার ছেলে? আর দে সেফ? ওদের একবার দেখতে চাই আমি।

- নিশ্চয়ই দেখবেন। তার আগে আপনি একটু ভাল হয়ে উঠুন। আপনার ফ্যামিলি অন্য একটা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আপনি সুস্থ হয়ে উঠলে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে ওঁদের কাছে।

রঘুবীর একটুক্ষণ চুপ। ঠোঁট চাটছে। স্থির গলায় বলল, আমি নিজেও মেডিক্যাল প্রফেশনে আছি। আই অ্যাম অলসো আ ডক্টর। আমি শক্ত মনের লোক। আমার কাছে কিছু লুকোবেন না প্লিজ।

ডাক্তার মানুষটি ভাল অভিনেতা নন। ঈষৎ বিড়ম্বিত গলায় বললেন, না না লুকোনর কী আছে?

বুকের মধ্যে এক টন ওজনের ভারী একটা পাথর যেন রাখল কেউ। একটা বড় শ্বাস ফেলে রঘুবীর বলল, আমি যা বোঝার বুঝে গিয়েছি।

ডাক্তার কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন রঘুবীরের দিকে। তাঁর কপালের কয়েকটা রেখা গাঢ় হল। রঘুবীরের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। গলাটা খাদে নিয়ে গিয়ে বললেন, বোথ অফ দেম ডায়েড। আপনার স্ত্রী-পুত্র আর নেই। আপনাদের ড্রাইভারও বাঁচেনি। ফরচুনেটলি ইউ আর দ্য সোল সারভাইভার।

৪

লম্বা ফালি দেওয়া বারান্দা। ভিভিয়ান বসে আছে পুরনো কাঠের চেয়ারটায়। সস্তার সিগারেট টানছে চোখ বুঁজে। ষাট পার

করলেও ভিভিয়ানের মুখের চামড়া এখনও কুঁচকোয়নি। ফর্সা গায়ের রং রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। ভিভিয়ানের শীতবোধ একটু কম। একটা পাতলা গেঞ্জির ওপর হাফহাতা সোয়েটার পরে আছে।

একটু আগে নিচে ফুলগাছগুলোর আগাছা পরিস্কার করে জল দিয়ে এসেছে ভিভিয়ান। গাছগাছালি নিয়ে থাকতে ভালবাসে, রোজ বিকেলে এটাই রুটিন ভিভিয়ানের। পাশে একটা বেতের মোড়ায় বসে আছে কর্মা। ফরেস্টের একটা পুরনো সরকারি বাংলো আছে কাছে। কর্মা তার চৌকিদার। বেদম কুঁড়ে আর পাঁড় মাতাল। বাংলোয় লোক আসে না। কর্মা সময় কাটাতে চলে আসে ভিভিয়ানের কাছে।

ভিভিয়ান সিগারেটে একটা টান দিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হল আজ?

- স্কুল থেকে বেরিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। চকবাজারে মিটিং ছিল। গ্রেগরি জবাব দিল।

- হ্যাঁ মনে পড়েছে। আজ তো মিটিং ছিল দার্জিলিংয়ে। দাওয়াইপানির রোহিত পরশু এসেছিল আমার কাছে। বলে গিয়েছিল চকবাজারে একবার যাবার জন্য। মিটিংয়ের পর দেরি হলে ফেরার ব্যবস্থাও করে দেবে বলেছিল।

- এদিকের কয়েকজন পিজো গাড়ির মালিক গিয়েছিল মিটিংয়ে। আমি তো সেরকমই একটা গাড়িতে ফিরেছি। রোহিত বলেছিল যখন তাহলে তুমি গেলে না কেন? গ্রেগরি আলগা গলায় জানতে চাইল।

- আমার ওসব ভাল লাগে না। ভিভিয়ান হাসল, তবে সেই অজুহাত তো আর দেওয়া যায় না। আমি রোহিতকে বলেছিলাম যে আমার শরীরের অবস্থা ভাল না। ডাক্তার রেস্ট নিতে বলেছে।

গ্রেগরি গম্ভীর স্বরে বলল, গেলে পারতে। দিনকাল ভাল নয়। যত দিন যাচ্ছে পাহাড়ের আন্দোলন তত শক্তিশালী হচ্ছে। সামনের সপ্তাহে দার্জিলিং সীমান্তে একটা জনসভা আছে। নতুন করে গোর্খাল্যান্ড গড়ার ডাক দিয়েছে নেতারা। প্রয়োজনে প্রতিবেশী জেলার কিছু পাহাড়ি এলাকার মৌজা গোর্খাল্যান্ডের মধ্যে নেবার দাবি করা হবে। সেসব দাবি নিয়েই অনশনের ডাক দেবে নেতারা। তারপর আইন অমান্য আছে।

ভিভিয়ান বলল, জানি আমি। সেখানে লাগাতার ভুখ হরতাল হবে। আমাকে রোহিত বলেছে যাবার জন্য।

- আজ দার্জিলিংয়ে মিটিংয়ের পরে রোহিত আমাকে ডেকেছিল আলাদা করে। দাওয়াইপানির প্রত্যেক বাড়ি থেকে দু'জন করে পুরুষকে যাবার জন্য বলেছে ওরা। তোমাকেও নিয়ে যেতে বলেছে। তুমি কিন্তু যেও বাবা।

ভিভিয়ান সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, উঁহু আমাকে ছেড়ে দে। আমি যাব না।

- যাবে না? গ্রেগরি একটু যেন বিস্মিত হয়েছে। অবাক গলায় বলল, কেন যাবে না?

- আমার খুশি তাই যাব না। এই দাবি অযৌক্তিক। এর সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে রাজি নই। ভিভিয়ানের স্বরে মৃদু উত্তাপ।

গ্রেগরি গলাটা খাদে নিয়ে গিয়ে বলল, দেওয়ালেরও কান আছে। আস্তে কথা বলো। লোকে শুনে ফেলবে। তারপর লিডারদের কানে গিয়ে লাগিয়ে দেবে। ওরা রেগে গেলে আমাদের এখানে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে।

ভিভিয়ান হাসছে মৃদু মৃদু। বলল, তোকে তো এর আগেও অনেকবার বলেছি আমি। তোর ঠাকুরদা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের লোক। একবেলা খাওয়া জুটলে অন্যবেলা খাওয়া জুটত না। থাকত দার্জিলিংয়ের এক বস্তিতে। রাস্তাঘাট সাফ করত। এককথায় শহরের ঝাড়ুদার। গরিবের গরিব ছিল বাবা। একটাই ছেঁড়াখোড়া শীতের জ্যাকেট ছিল, একটাই কানঢাকা চামড়ার টুপি, একটাই মোটা কাপড়ের প্যান্ট। মাথা গোঁজার মতো আস্তানা ছিল না। তখন ক্রিশ্চান ধর্ম নিলে মিশনারি স্কুলে পড়া যেত। মিলত দু'মুঠো খাবার। একদম বিনা পয়সায়।

- জানি।

- দার্জিলিংয়ের কয়েকশো গোর্খা ক্রিশ্চান ধর্ম নিয়েছিল। ওদের সঙ্গে বাবাও ধর্ম পাল্টেছিল। নাম বদলে হয়েছিল ড্যানিয়েল লেপচা। তার রক্ত তোর আমার শরীরে বইছে। পুরনো ঋণ ভুলে গেলে চলবে না গ্রেগরি। আমি কেন এই আন্দোলনে সামিল হব? এই আন্দোলনের সঙ্গে আমার নাড়ির টান আসবে কোন যুক্তিতে?

গ্রেগরি কেটে কেটে বলল, রোহিত থাপা কিন্তু এদিকে জনে জনে হুমকি দিয়ে রেখেছে, আন্দোলনে সামিল না হলে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেবে।

ভিভিয়ান তেরচা চোখে গ্রেগরির দিকে তাকিয়ে বলল, গোর্খাল্যান্ডের দাবি কতটা বাস্তব বলে মনে করিস তুই?

গ্রেগরি বলল, তাজ্জব তো! কী বলছ তুমি! এই দাবি তো সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা তিন কোটি গোর্খার আত্মপরিচয়ের যে চাহিদা তারই বহিঃপ্রকাশ। তেলেঙ্গানার চাইতে এই দাবি বেশি ন্যায়সঙ্গত।

ভিভিয়ান দুলে দুলে হাসল, বেশ। এবার তুই আমাকে বল, গোর্খারা কি স্বতন্ত্র জাতি?

- নিশ্চয়ই। সেটাই তো আজ মিটিংয়ে লিডাররা বলল। ঐতিহাসিকভাবে যে স্থায়ী জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, যাদের অভিন্ন ভাষা, অভিন্ন বাসভূমি, অভিন্ন অর্থনৈতিক জীবন ও অভিন্ন মানসিক গঠন রয়েছে, তাদেরই তো স্বতন্ত্র জাতি বলা হয়। সেই হিসেবেই গোর্খারা স্বতন্ত্র জাতি। আর সেই কারণেই তাদের নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে।

ভিভিয়ান মাথা নেড়ে বলল, দার্জিলিং, কার্সিয়াং আর কালিম্পং - এই তিনটে মহকুমা মাত্র। এত ছোট অঞ্চল নিয়ে কি আলাদা রাজ্য সম্ভব?

গ্রেগরি জোর দিয়ে বলল, কেন সম্ভব নয়? সিকিম বা গোয়া তো হাতের কাছেই আছে। আর রাজ্য কেন, এর থেকে ছোট রাষ্ট্রই তো দুনিয়ায় আছে। ভ্যাটিক্যান সিটির কথা ভুলে গেলে? যার জনসংখ্যা এক হাজার ছোঁয়নি এখনও। সিঙ্গাপুর বা মোনাকোর মতো দেশও তো আছে। আসলে প্রশ্নটা রাজনৈতিক সদিচ্ছার। তাছাড়া ডুয়ার্সের কিছু কিছু পাহাড়ি এলাকায় থাকা মৌজা গোর্খাল্যান্ডে ঢুকিয়ে নেওয়ার কথা বলছে আমাদের নেতারা।

ভিভিয়ান বলল, হরতালে সামিল না হওয়াই ভাল। প্রশাসন শক্ত হাতে আন্দোলনের মোকাবিলা করবে। আমার মনে হচ্ছে সেদিন তুমুল অশান্তি হবে। যে সরকারই বাংলার মসনদে থাকুক কেউ এই দাবি মানবে না। একবার বঙ্গভঙ্গ দেখেছে দেশ। দ্বিতীয়বার সেটা করতে দেবে না কোনও সরকার।

গ্রেগরি দৃঢ় গলায় বলল, আমাদের দাবি আমরা আদায় করে নেব।

ভিভিয়ান কেটে কেটে বলল, গোর্খাল্যান্ডের দাবি তো শুধু

গোর্খাদের। আর কেউ কি এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে? তোকে তো বললাম। আমরা ক্রিশ্চান ধর্ম নেওয়া মানুষ। আমাদের সঙ্গে এই আন্দোলনের সম্পর্ক নেই একটুও।

- ভুল করছ বাবা। এটা গোটা পাহাড়বাসীর দাবি। পাহাড়ের মুসলিমরা এই আন্দোলনের সমর্থনে সাদামাটা করে ঈদ পালন করছে। এখানকার অনেক পুরনো বাঙালি পর্যন্ত সমর্থন করছে এই আন্দোলন। আমাদেরও এই আন্দোলনের সঙ্গে থাকতেই হবে।

- যারা গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সমর্থন করছে তারা হয় ভক্তিতে করছে, নয়তো ভয়ে। বড় নেতাদের আমি চিনি না, তাদের কথা বলতে পারব না। কিন্তু রোহিতের মতো ছোট মাপের হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা নেতারা এখন হাতির পাঁচ পা দেখছে। যারা একটু চতুর তারা লোককে ভয় দেখিয়ে সংগঠনের নামে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। নিজের ব্যাংক ব্যালান্স বাড়িয়ে নিচ্ছে।

- দু'চারজন মানুষকে দিয়ে পুরোটা বিচার করতে যেও না বাবা। তাছাড়া একটা কথা বলি, এই আন্দোলন দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিলেও গোর্খাল্যান্ডের দাবি নস্যাৎ করা যাবে না।

ভিভিয়ান মুচকি হেসে বলল, তুই তো রোহিতের মাউথস্পিকারের মতো কথা বলছিস দেখছি। তোর নিজেরও কি মনে হয় না হিল কাউন্সিলের মতো ললিপপ পেলে গোর্খাল্যান্ডর দাবি থেকে সরে আসবে না নেতারা?

- এই দাবি থেকে সরে আসার পর আগের আমলের সবচাইতে বড় নেতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছিলেন। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন কিন্তু প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। আজ বাদে কাল যদি এখনকার সুপ্রিমো এই দাবি ছেড়ে দেন তাহলে কালক্রমে তিনিও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবেন। কিন্তু নতুন নেতা ধরে এই আন্দোলন আবার প্রাসঙ্গিক হবে।

ভিভিয়ান বলল, কিন্তু রক্তের বন্যায় যদি এই আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়?

গ্রেগরি দৃঢ় গলায় বলল, তাহলেও ফিনিক্স পাখির মতো এই আন্দোলন আবার মাথা তুলবে। এটাই ইতিহাসের লিখন।

ভিভিয়ান হাসল, ইতিহাসের লিখন আগে থেকে কে পড়তে পারে! ভবিষ্যতে কী হবে সে তো তার পরের ইতিহাস বলবে।

গ্রেগরি বলল, আজ মিটিংয়ে তো নেতারা বলছিল, স্রেফ যাতায়াতের নিরিখেও পাহাড় এখনও অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। জঙ্গি কবলিত কাশ্মীরের রেলপথ, রাজপথের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সীমান্তে অবস্থানের জন্য দার্জিলিং রাজনীতি বা কূটনীতিতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ দার্জিলিংয়ের রাস্তার জন্য টাকা রাস্তাতেই আটকে থাকে। দার্জিলিংয়ের প্রধান রাস্তা হিলকার্ট রোড বন্ধ হয়ে রয়েছে কতদিন ধরে কারও কোনও হেলদোল নেই। সিকিমে যে ভাবে অনুদান দিয়ে নিয়মিত হেলিকপ্টার চালানো হয় তেমন কিছুও এদিকে চালু হল না। একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দম নিল গ্রেগরি।

ভিভিয়ান একটু হেসে বলল, আমি তোর সঙ্গে একমত। সমতলের লোক যত বেশি পাহাড়ে আসাযাওয়া করবে তত স্থানীয় মানুষের বিচ্ছিন্নতার বোধ কমবে। দার্জিলিংয়ের মানুষের সঙ্গে গোটা রাজ্যের মানুষের যোগাযোগ, আদানপ্রদান বাড়ানো দরকার। নেপালি ভাষাচর্চার জন্য অ্যাকাডেমি, নেপালি সাহিত্য সংস্কৃতির গবেষণা, সমতলেও নেপালি ভাষায় পড়ার জন্য স্কুল কলেজ খোলা উচিত।

গ্রেগরি যুক্তিবিস্তার করল, কিন্তু সরকার তো সে কথা ভাবছে না। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার। দার্জিলিংয়ের মানুষের আলাদা আলাদা ভৌগলিক অবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি, পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলির স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্যের মধ্যেই এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছে বরাবর। সেজন্যেই তো সমস্যা বাড়ছে।

ভিভিয়ান শান্ত স্বরে বলল, আবেগটাকে সরিয়ে রেখে ভেবে দেখিস, আমার মনে হয় অতীতে কোন ভূমি কাদের ছিল সেসব প্রশ্ন আলোচনায় উৎসাহ দিলে কিন্তু দার্জিলিংয়ের দেখাদেখি আলাদা করে কোচবিহার বা কামতাপুর রাজ্যের উৎসাহ বাড়বে। সেটা হবে আগুন নিয়ে খেলা। এর পরিণতি কী কেউ জানে না, কোথাও গিয়ে তা শেষ হবে।

গ্রেগরি একটু যেন ক্ষুন্ন হয়েছে। তেড়িয়া গলায় বলল, তাহলে তুমি কী মনে কর? আলাদা রাজ্য কি সম্ভব নয়?

ভিভিয়ান ঘাড় নেড়ে বলল, একটা পথ খোলা আছে। নতুন করে কোনও কাউন্সিল গড়ে তাকে বাড়তি ক্ষমতা দিতে হবে। তাকেই রাজ্যের মধ্যে আঞ্চলিক স্বশাসনের রূপ দিতে হবে। সেই কাউন্সিলই হবে পৃথক রাজ্যের দাবির বিকল্প রাজনৈতিক সমাধান।

গ্রেগরি চুপ করে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। ভিভিয়ান অনুচ্চ স্বরে কিন্তু কেটে কেটে বলল, একটা কথা বুঝতে হবে লিডারদের। পৃথক রাজ্য সম্ভব নয়। সেটা কোনওভাবেই আদায়যোগ্য নয়।

৫

- গাড়ি আর যাবে না স্যার।

এতক্ষণ ধরে এই ভয়টাই করছিল রঘুবীর। করাটাই অবশ্য স্বাভাবিক। নিজেই নিজেকে বাছা বাছা কিছু গালি দিল। শিলিগুড়িতে যখন গাড়ি ভাড়া করে তখন মাথায় নির্ঘাৎ ভূত চেপেছিল। নইলে পাহাড়ি পথে স্থানীয় ড্রাইভার না নিয়ে সমতলের ড্রাইভারের গাড়িতে ওঠার ভুল কেউ করে কখনও!

মনে মনে প্রমাদ গুনল রঘুবীর। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কেন যাবে না?

ড্রাইভার ছেলেটির নাম কৃষ্ণগোপাল। শিলিগুড়ির ঘুঘুমালিতে বাড়ি। রোহিণী থেকে কার্শিয়াং আসার পথে একটা রেস্তোরায় দাড়িয়েছিল রঘুবীর। সেখানে কৃষ্ণগোপাল মোমো খেতে খেতে গল্প করছিল। কথায় কথায় জানিয়েছিল যে কার্শিয়াং বা দার্জিলিং রুটে সে হামেশাই আসা যাওয়া করে ট্যুরিস্ট নিয়ে। কিন্তু যে অফবিট জায়গায় যেতে চাইছে রঘুবীর সেই দাওয়াইপানির পথে সে আগে কখনও আসেনি। জায়গাটার নাম পর্যন্ত শোনেনি।

রঘুবীর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে নিয়ে যেতে পারবে তো? কৃষ্ণগোপাল একগাল হেসে আশ্বাস দিয়েছিল, কোনও চাপ নেই। কিন্তু সেই ভালমানুষ টাইপ ছেলে এখন রীতিমত বিগড়ে গেছে। গজগজ করে বলল, আমি আর কী বলব। আপনি নিজেই তো দেখছেন স্যার। এমনিতেই ভাঙাচোরা সরু পথ, ছ'ফিটও চওড়া হবে না। তার মধ্যে দু'দিকে ঘন জঙ্গল। এত খাড়াই রাস্তা, নামছি তো নামছিই সেই তখন থেকে। এরপর নামলে আর গাড়ি ঘোরাবার জায়গা পাব না। আমি আর যাব না। আপনি নেমে যান স্যার।

এর আগেও কৃষ্ণগোপাল এমন বিরক্তি দেখিয়েছে। তবুও তুইয়ে তুইয়ে এতটা নিয়ে আসা গেছে। কিন্তু এবার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আর সুবিধে হবে না। মেজাজ দেখাল রঘুবীর, এখানে কোথায় নামব? নেমে কী করব?

- সে আমি জানি না স্যার। কৃষ্ণগোপাল তিতকুটে গলায় বলল, যে হোটেলে আপনি থাকবেন তাদের ফোন করুন। তারা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনি নেমে গেলে আমি গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ি ফিরে যাব।

কৃষ্ণগোপালকে দোষ দেওয়া যায় না। সেই কখন থেকে গাড়ি ড্রাইভ করছে তো করছেই। কখনও খাড়া চড়াই। কখনও আবার অনেকটা উৎরাই। কোথাও রাস্তা মসৃণ। কোথাও আবার এতটাই খারাপ যে সেটা রাস্তা না অন্য কিছু সেটা বোঝা যায় না। এতক্ষণ যেমন গাড়িটা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি পথ ধরে নেমে আসছিল। একেবারে আচমকা ঘ্যাস্‌স করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রঘুবীর কৃষ্ণগোপালের পাশের সিটে বসেছে। হাত বাড়িয়ে পেছনের সিটে রাখা লাগেজব্যাগ টেনে এনে রঘুবীরের হাতে ধরিয়ে দিল কৃষ্ণগোপাল। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। এরপর আর কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল রঘুবীর। কোমর ধরে গিয়েছিল এতক্ষণ গাড়িতে বসে থেকে থেকে। এবার কোমরটা বুঝি একটু আরাম পেল।

সানগ্লাসটা খুলে তাকাল এদিক ওদিক। অপাপবিদ্ধ প্রকৃতির অকৃপণ উৎসার এখানে। ধুপি, চাপ, কাটুস, রডোডেনড্রন আর নানা প্রজাতির বাঁশ গাছ ঘন হয়ে আছে পাহাড়ি পথের দু'দিকে। আশ্বিন শেষের পাহাড়তলি ঘন সবুজ রংয়ে স্নান করেছে।

বড় করে শ্বাস নিল রঘুবীর। আআহ্‌! জংলি লতাপাতা আর গাছপালার গন্ধ ঢুকে পড়ছে বুকে। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকার আর বর্ণের নাম না জানা বুনো ফুল। উড়ে বেড়াচ্ছে রংবাহারি প্রজাপতি। নিস্তব্ধ জঙ্গলের গভীর থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝির তীব্র ডাক।

কৃষ্ণগোপালের প্রকৃতি নিরীক্ষণে একটুও উৎসাহ নেই। ঘ্যানঘ্যানে গলায় কাটা রেকর্ডের মতো সেই একই কথা আবার বলল, ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিন স্যার।

ফোনটা বার করল রঘুবীর। সেই শিলিগুড়ি থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছিল কিন্তু এতক্ষণ যতীন রাইকে ফোনে পাওয়া যায়নি। কপাল ভাল অবশেষে লাইন পেল। তবে যতীন রাই নয় ফোন ধরল একটি কিশোরী। রিনরিনে গলায় সাড়া দিল, হ্যালো।

একটু অবাক হয়েছে রঘুবীর। রং নাম্বার হয়ে গেল নাকি! হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, এটা যতীন রাইয়ের নম্বর না?

-আমি যতীন রাইয়ের মেয়ে। পুষ্পা। আপনি কে বলছেন ?

- রঘুবীর মিশ্র। কলকাতা থেকে আসছি। তোমার বাবার সঙ্গে কাল রাতে কথা হয়েছে। তাঁর হোম স্টে-তেই আমার ওঠার কথা। তাঁকে ফোনটা দাও।

পুষ্পা দু'-চার সেকেন্ড চুপ। ফোনের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে কাউকে কিছু বলল নেপালিতে। তারপর বলল, আপনি এখন কোথায় আছেন স্যার ?

রঘুবীর এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বলল,
দাওয়াইপানিতে তো আগে আসিনি। জঙ্গলের মধ্যে এটা কোন জায়গা সেটা বলতে পারব না। এখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। ফলে ইন্টারনেট না থাকায় জিপিএস কাজ করছে না। ঠাহর করতে পারছি না এই জায়গাটার লোকেশন।

- বাবার বলে দেওয়া রুট ধরেই এসেছেন তো?

- তোমার বাবা যেমন বলে দিয়েছিলেন তেমন তেমন রুটেই এসেছি। শিলিগুড়ি থেকে শিমুলবাড়ি হয়ে রোহিণীর মন্দিরের পাশের চড়াই রাস্তা ধরে কার্শিয়াং এসেছিলাম। সেখান থেকে দিলারাম পেরিয়ে জোড়বাংলো হয়ে মংপুর দিকে পৌঁছেছি। পাঁচ মাইল চড়াই উতরাই পেরিয়ে এসেছিল থ্রি মাইলসের মোড়।

- থ্রি মাইলসের মোড় পার করেছেন কতক্ষণ আগে ?

রঘুবীর ঘড়ি দেখে বলল, তা বেশ কিছুক্ষণ হল। সেখান থেকে একটা ভাঙা রাস্তা নেমেছে দাওয়াইপানির দিকে। সেই পথেই খানিকটা নামার পর দাঁড়িয়ে গেছে গাড়ি। আমার গাড়ির ড্রাইভার বেঁকে বসে বলছে, আর গাড়ি যাবে না।

পুষ্পা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, স্যার একটু মুশকিল হয়েছে। আমরা দাওয়াইপানি ছেড়ে দার্জিলিংয়ে চলে এসেছি আজ সকালে।

রঘুবীর কথাটা বুঝতে একটু সময় নিল। হকচকিয়ে গিয়ে বলল, মানে?

পুষ্পা বিব্রত স্বরে বলল, একটা প্রবলেম হয়েছে স্যার। আমার বাবার অ্যাজমার দোষ আছে। কিছুদিন ধরেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ইনহেলার কাজ করছিল না। কাল রাতে বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আমরা বাবাকে বাড়িতে রাখার সাহস পাইনি। আজ কাকভোরে উঠে বাবাকে নিয়ে আমি আর আমার মা দার্জিলিংয়ে চলে এসে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি।

পুষ্পা যা বলল তা স্নায়ুতন্ত্র শিথিল করার পক্ষে যথেষ্ট। ফেসবুকের বন্ধু মহান্তির পিন্ডি চটকাতে ইচ্ছে করছে এখন। তার জন্যেই তো এমন ফাঁসা ফেঁসেছে আজ।

ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার অঞ্জন মহান্তি থাকে কটকে। সুযোগ পেলেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। দুর্গাপুজোর আগ দিয়ে দাওয়াইপানিতে এসে ক'দিন কাটিয়ে গিয়েছিল মহান্তি। ফেসবুকে আপলোড করা ছবি দেখেই রঘুবীর জানতে পেরেছিল এই পাহাড়ি জনপদের কথা।

এমনিতেই অতলান্ত বিষাদ তারপর প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনে বিরক্ত লাগছিল। নিত্যদিন রুগির ঢেউ সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল রঘুবীর। সহকর্মী সোমনাথ নিজেই একদিন বলল, দাদা, কী চেহারা করেছ বলো তো! ক'দিন একটু পাহাড় বা জঙ্গল থেকে ঘুরে এসো। হাসপাতাল নিয়ে ভেবো না। ও আমি সামলে নেব। হাসপাতালের দু'জন নার্স সোমনাথের কথার ধুয়ো তুললেন। পরামর্শ দিলেন কিছুদিন ঘুরে আসার জন্য। অবশেষে রাজি হয়েছে রঘুবীর। লক্ষ্মীপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত টানা ছুটি নিয়ে এসেছে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবার জন্য।

মহান্তি জানিয়েছিল, দাওয়াইপানিতে হোটেল লজ কিচ্ছু নেই। দু'-চারটে বাড়িতে হোম স্টে-র ব্যবস্থা। মহান্তি ছিল যতীন রাইয়ের বাড়িতে। মহান্তির থেকে যতীন রাইয়ের নম্বর নিয়ে ফোনে কথা বলেছিল দিন সাতেক আগে। তারপর এখানে আসার প্ল্যান করেছিল রঘুবীর। কাল রাতেও কথা হয়েছিল একবার।

রঘুবীর যে অতান্তরে পড়েছে সেটা আন্দাজ করেছে পুষ্পা। আশ্বস্ত করে বলল, দাওয়াইপানিতে আরও দুটো হোম স্টে আছে। আমি যোগাযোগ করছি তাদের সঙ্গে। আপনি গাড়িটাকে

ছেড়ে দিন স্যার। লাগেজ বেশি না হলে হাঁটতে থাকুন নিচের দিকে।

- কতক্ষণ হাঁটব?

- পনের মিনিট বড় জোর। আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফোন করছি আপনাকে।

অগত্যা গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিল রঘুবীর। কৃষ্ণগোপাল বেশ কসরত করে মুখ ঘোরালো গাড়িটার। একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল গাড়ি। তারপর পাহাড়ি বনপথ ধরে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উঠে গেল ওপরদিকে।

ততক্ষণে দুপুরের হলদে রংয়ে সোনালি প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে।

৬

ভিড়ে গাদাগাদি মাঠ। গ্রেগরি আর ভিভিয়ান যেখানে বসে আছে তার সামনের রাস্তায় পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কিছুদিন আগেই রেলিং বস্তির একটা জনসভায় পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠায় লাঠিচার্জ করেছিল পুলিশ। কাঁদানে গ্যাস পর্যন্ত চলেছিল। আজকেও হয়তো তেমন কিছু হতে পারে বলে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের গোপন রিপোর্ট আছে। সে কারণেই পুলিশ ও প্রশাসনের কড়া নজর রাখছে আজকের জমায়েতের ওপর।

মঞ্চে আসীন নেতাদের মধ্যে অনিল মোক্তান আজ মধ্যমণি। সেই শুরুর দিনগুলো থেকে পাহাড়ের আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন মাঝবয়সি অনিল। একসময় দার্জিলিং-শিলিগুড়ি রুটে পিজো গাড়ি চালাতেন। কিন্তু গোর্খাদের দাবি আদায় নিয়ে নিরলস সংগ্রাম অনিলের জীবনটাকে বদলে দিয়েছে গত কয়েক বছরে। অনিল উঠে এসেছেন আন্দোলনের সামনের সারিতে।

অনিল ছাড়াও বেশ কিছু নামী নেতৃত্ব রয়েছেন আজকের সভায়। কালিম্পং, কার্শিয়াং, সোনাদা থেকে এসেছেন যথাক্রমে গণেশ প্রধান, সন্তোষ সুব্বা, শ্রদ্ধা ভুজেলের মতো আগুনখেকো জননেতারা।

ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। গায়ের র‍্যাপারটা দিয়ে ভাল করে মাথাটা ঢেকে নিল গ্রেগরি। দূরের আকাশে ব্যাঙের ছাতার মতো আকৃতির একটা মেঘ এসে দাঁড়িয়ে ছিল। লালচে আগুনের গোলার মতো রং। যত সময় গড়াচ্ছে মেঘটা আয়তনে বড় হচ্ছে ক্রমশ। গ্রেগরির মনে হল মেঘটা ভাসতে ভাসতে এবার এসে পড়েছে জমায়েতটার ঠিক ওপরে।

গণেশ প্রধান প্রথমে বলতে এসে আবহ তৈরি করে দিলেন। গমগমে গলায় বললেন, সাহসী, কর্মঠ গোর্খাদের ব্রিটিশরা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে পৃথিবীর কত না প্রান্তে ব্যবহার করেছে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তার কোনও হিসেব নেই। আফগানিস্তান, বার্মা, মালয়, আফিম যুদ্ধে বিধ্বস্ত চিনের উপকূল, সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে দিল্লি থেকে শুরু করে গত শতকে মিশর, তুরস্ক, ফ্রান্স। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই যুগে কামানের খাদ্য ছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা, বড্ড সস্তায় পাওয়া মানুষগুলো। ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। প্রশাসক বদলেছে। কিন্তু আমাদের প্রতি প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি। আমরা বরাবর বঞ্চনার শিকার। এবার সময় এসেছে আমাদের নিজেদের দাবি ছিনিয়ে নেবার।

গণেশের বক্তব্য শেষ হল তুমুল হাততালিতে। এবার বলতে এলেন শ্রদ্ধা ভুজেল। শ্রদ্ধা আবেগদৃপ্ত গলায় বললেন, দার্জিলিংকে বলা হয় পাহাড়ের রানি। রাজা বলা হয় না। অর্থাৎ দার্জিলিং কোনও রূপবান যুবক নয়, রূপসি। সবাই ধরে নেয় যে, দার্জিলিং মানে রূপবতী এক নারী। যেন ইচ্ছে করলেই তাকে লুঠ করা যাবে। বাস্তবে সেই ভোগ করা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবুও এই ভাবনাটাই কাউকে কাউকে সুখ দেয়। উচ্চারণ না করা আকাঙ্খার মতো থেকে যায় মনের মধ্যে। যারা পাহাড়ে দু'দিনের জন্য ঘুরতে আসে তারা হোটেল থেকে ম্যাল অবধি রাস্তা চিনে নিয়ে ভেবে নেয় গোটা পাহাড় বুঝি তাদের চেনা হয়ে গেল। সমতলের মানুষ কর্মসূত্রে পাহাড়ে আসে। দু'-চার বছর আলগা আলগা কাটিয়ে ভেবে ফেলে গোটা পাহাড়টাকে বুঝি জানা হয়ে গেল। কিন্তু পাহাড়ের স্বরূপ বোঝা কি অত সহজ? পাহাড়বাসীর মন বোঝা কি অত সহজ?

জনতা গর্জে উঠল, পাহাড়কে বোঝা অত সহজ নয়!

গ্রেগরির পাশে বসে আছে বছর পঁচিশেকের এক যুবক। সে ইশারা করে শ্লোগান দিতে বলল। জনতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গ্রেগরিও বলে উঠল, পাহাড়কে বোঝা অত সহজ নয়, পাহাড়বাসীর মন বোঝা অত সহজ নয়।

যুবকটি পকেট থেকে বিড়ি বের করে এগিয়ে দিল গ্রেগরির দিকে। বিড়িটা ধরিয়ে নিল গ্রেগরি। আগুনটাকে দেখল এক পলক। লম্বা টানে ধোঁয়াটাকে নিল ফুসফুসের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ড রেখে ধোঁয়াটাকে বের করে দিল বাইরে। অস্বস্তিটাও যেন বেরিয়ে গেল ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

একসঙ্গে হাজার হাজার মানুষ শ্লোগান দিচ্ছে। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত তোলপাড় হচ্ছে গ্রেগরির। রক্তের মধ্যে যেন স্ফুলিঙ্গ জ্বলতে শুরু করল গ্রেগরির। বিন্দু বিন্দু সাহস পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল বুকের ভেতর।

যুবকটি সঙ্গে আলাপ হল। নাম রাজেন সুনদাস। সেই সিংমারির থেকে এসেছে এখানে। বাবা নেই। মা বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী। অল্প কিছু খেতিজমি আছে। তার প্রয়াত বাবার মতোই রাজেন কৃষিকাজ করে। সকাল সকাল উঠে রান্না করে মা-কে ভাত খাইয়ে এসেছে এখানে। গোর্খাল্যান্ড হলে ঠিক কী উপকার হবে সেটা জানে না রাজেন। কিন্তু নেতৃত্বের ওপর তার অগাধ আস্থা। সে পৃথক গোর্খাভূমি চায়। বিশ্বাস করে গোর্খাল্যান্ড হলে তাদের জীবনযাপনের মান আরও ভাল হবে।

পেছন থেকে একজন গ্রেগরিদের চুপ করতে বলল। লোকটির আঙুল অনুসরণ করে মঞ্চে চোখ চলে গেল গ্রেগরির। এবার মাইক্রোফোন চলে গেছে সন্তোষ সুব্বার হাতে।

সন্তোষ সুব্বা বললেন, সেদিন রেলিং বস্তিতে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করেছে আমাদের ওপর। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটিয়েছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে আমাদের। অনেক সহ্য করা হয়েছে। আর নয়। এবার সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার। সেই লড়াইয়ের ডাক দিতেই এখানে এসেছি আমরা। যে কোনও মূল্যে গোর্খাল্যান্ড চাই আমাদের।

নিজের আগুনে মেজাজ জনতার মধ্যে চারিয়ে দিলেন সন্তোষ। বক্তব্য শেষ করে যখন নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন তখন জনতা আকাশ ফাটিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের বজ্রনাদে কেঁপে উঠছে জমায়েতের ময়দান। ভিড়ের মধ্যে থেকে শ্লোগান উঠল, গোর্খাল্যান্ড চাই! উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড!

সন্তোষের পর বলতে উঠলেন পোড়খাওয়া নেতা অনিল।

মাউথস্পিকারটা হাতে নিয়ে জমায়েতের কালো কালো মাথাগুলোর দিকে তাকালেন। শ্লোগান চলছিল এতক্ষণ। দু'হাত তুলে উত্তাল গর্জনটাকে পোষ মানালেন অনিল। কেটে কেটে বললেন, দার্জিলিং পরিস্থিতি নিয়ে শাসকের ভূমিকা পরম্পরাগতভাবেই ভুল। প্রশাসক দার্জিলিংকে ধরে নেয় সমস্যা হিসেবে। আসলে দার্জিলিং কোনও সমস্যা নয়, পরিস্থিতি। মানুষের শরীরে যদি কোথাও ঘা হয় সেটা হল সমস্যা। কিন্তু একটা জুডুল, যা দেহের বাকি অংশের তুলনায় অন্যরকম, তা সমস্যা নয়, তা হল পরিস্থিতি। পরিস্থিতিকে সমস্যা ধরে নিয়ে এগোতে গিয়েই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ঘোরালো হয়ে পড়ছে সবকিছু। যে কোনও সমস্যার সমাধান দরকার, কিন্তু পরিস্থিতির জন্য চাই পর্যালোচনা। সেখানেই ভুল করছে প্রশাসক।

জলের বোতল তুলে নিয়ে দু'ঢোক জল গলায় ঢাললেন অনিল। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বললেন, দার্জিলিং আমাদের আত্মা, আমাদের প্রাণ। সেই দার্জিলিংয়ের মন আজ ভাল নেই। সূর্য অস্ত যাবার সময় আগুন রঙা মেঘের ছায়া এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর পড়ে ঠিকই কিন্তু পথের আগুনের ধোঁয়ায় তা আর দেখা যায় না। সংগ্রাম আন্দোলনের দিন শুরু হয়েছে পাহাড়ে। আমাদের সামনে আরও তীব্র লড়াইয়ের দিন আসছে। আমরা ভয় পাই না। আমরা লড়ব। যে কোনও মূল্যে আমাদের গোর্খাল্যান্ড চাই।

জনতার মধ্যে থেকে গর্জন করে দাবি উঠল, গোর্খাল্যান্ড দিনু পড়ছ!

রাজেন সুনদাস হাত মুঠো করে শ্লোগান তুলল। তার দেখাদেখি গ্রেগরি আর ভিভিয়ানও চেঁচিয়ে উঠল, উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড .. গোর্খাল্যান্ড দিনু পড়ছ!

ঠিক তখনই একটা হৈ চৈ শুরু হল ওদিকে। ভিড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল। সব আওয়াজ ছাপিয়ে কেউ একজন শ্লোগান দিল চিৎকার করে। তারপর গ্রেগরির মনে হল বিপুল একটা তরঙ্গ যেন জনতার একদিক থেকে উঠে ছড়িয়ে গেল পুরো ময়দান জুড়ে।

প্রশাসনের এক কর্তা ছিলেন একটা সরকারি গাড়িতে। সেই গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের কাচ লাঠি মেরে ভেঙে দিল জনতা। আতংকিত হয়ে গ্রেগরি তাকিয়ে দেখল কেউ একজন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে পুলিশের জিপে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে জিপটা।

মুহূর্তে রণক্ষেত্রের রূপ নিয়ে নিল গোটা পরিবেশ। পুলিশবাহিনীর দিকে পেট্রল বোমা ছুঁড়ে মারল কেউ। পাল্টা লাঠি চার্জ করতে শুরু করল পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাল পর পর দুটো। ফাঁকা হতে শুরু করল ভিড়টা।

গ্রেগরি আর ভিভিয়ান পড়ি মরি ছুটছিল। ছুটছিল সিংমারি থেকে আসা রাজেনও। ছুটতে ছুটতে আচমকা ফিরে তাকাল রাজেন। এতক্ষণের চেনা নিরীহ ঠান্ডা স্বভাবের রাজেন আচমকা বদলে গেছে অন্য মানুষে। চোখগুলো যেন জ্বলন্ত বারুদ, বছর পঁচিশেকের কোমল মুখটার প্রত্যেকটা পেশি কাঁপছে থিরথির করে। সেখানে ফুটে উঠেছে দুরন্ত ক্রোধ। অশ্লীল গালাগালি দিতে দিতে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিল পুলিশের দিকে। হিংস্র উল্লাসে গর্জে উঠল রাজেন।

ভিড়টা দৌড়চ্ছে রাস্তার দিকে। গ্রেগরির সামনে অগুনতি কালো কালো মাথা। তার মধ্যে দিয়েই ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে গ্রেগরি আর ভিভিয়ান। পাশে রাজেন।

হঠাৎ কান ফাটিয়ে বন্দুকের গুলির শব্দ কানে এল গ্রেগরির। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধূসর সস্তার জ্যাকেট পরা রাজেন পড়ে গেল হুড়মুড় করে। প্রবল কলরবের মধ্যেও রাজেনের অস্ফুট গোঙানি পরিস্কার শুনতে পেল গ্রেগরি।

রাজেনের মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। কাতরাচ্ছে ব্যথায়। কেউ বুঝতে পারেনি কী হয়েছে। পড়ে থাকা রাজেনের শরীরটাকে পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে জনতা। মাটিতে পড়ে যাওয়া রাজেনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ভিভিয়ান। গ্রেগরি কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

ভিভিয়ান শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে। আতংকে শুকিয়ে গেছে চোখমুখ। গ্রেগরি ভিভিয়ানের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। চিৎকার করে বলল, পালাও!

পাহাড়ে একটুকরো সমতলভূমিই দুষ্প্রাপ্য। যেখানে আজ জমায়েত হচ্ছে সেই খেলার মাঠটাও আয়তনে অপ্রতুল। ছুটতে ছুটতে মাঠ পার হয়ে এসে বড় রাস্তায় যখনই উঠতে যাবে গ্রেগরি আর ভিভিয়ান, ঠিক তখনই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া জনতার কলরব ছাপিয়ে আবার একটা কান ফাটানো আওয়াজ হল।

গ্রেগরি বুঝতে পারল বন্দুকের গুলি চলল আবার। কপালের বলিরেখাগুলোতে বাড়তি ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। চোখেমুখে বিপুল শূন্যতা। তীব্র একটা অব্যক্ত ব্যথা ছড়িয়ে গেল সম্পূর্ণ মুখটায়। অস্ফুটে কিছু একটা বলে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ভিভিয়ান।

মাটিতে পড়ে যাওয়া ভিভিয়ানের দিকে বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল গ্রেগরি। কী হয়েছে সেটা বুঝতে বুঝতেই কেটে গেল কয়েক সেকেন্ড। গ্রেগরির মনে হল আশেপাশের সবকিছু যেন দুলছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে সারা শরীরটা। চোখে অস্পষ্ট দেখছে বুঝি। ভিভিয়ানের সোয়েটারের ওপর ফুটে উঠেছে ছোপ ছোপ তাজা রক্তের দাগ।

৭

সেদ্ধ খাবারই রঘুবীরের বেশি পছন্দ। ভাজা-পোড়া পারতপক্ষে খায় না। রোজ সকালে নিয়ম করে হাঁটে। ফিরে এসে যোগাসন করে। ফলে এখনও যথেষ্ট ফিট রঘুবীর। এখন পাহাড়ি পথ ধরে সাবলীল ছন্দে হাঁটতে থাকা রঘুবীরকে যদি কেউ দেখে তাহলে চট করে বিদেশি বলেই ভুল করবে। শ্বেতাঙ্গদের মতো গায়ের রং, আউল বাউল চাপদাড়ি, খয়েরি সানগ্লাস, মাথায় পানামা ক্যাপ - ছ'ফিট উচ্চতার রঘুবীরকে দেখে চট করে বাঙালি বলে মনে হয় না।

কাঁধে ব্যাকপ্যাক নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিক ওদিক দেখছিল রঘুবীর।

একটু যে বুকের মধ্যেটা তার ছ্যাঁত ছ্যাঁত করছে না তা নয়। এমন ঘন জঙ্গল বড় একটা দেখা যায় না। মহান্তির কাছে শুনেছে এই জঙ্গলে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার আর লেপার্ড তো আছেই আরও কী কী আছে কে জানে!

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে গুগল আর্থ দিয়ে জায়গাটার চারদিক একবার দেখে নেবার চেষ্টা করছিল। ইন্টারনেট কানেকশন নেই। ফলে কতটা দূরে লোকালয় আছে, আর কতটা পথ হাঁটলে সেখানে পৌঁছবে সেটা বুঝতে পারছে না।

রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে এক জায়গায়। বাঁকটা ঘুরতেই জঙ্গল ফুঁড়ে, না বুনো জন্তু নয়, আবির্ভূত হয়েছে সাক্ষাৎ এক

বনদেবী।

চিকন চিকন চোখ, মঙ্গোলয়েড নাক, মোমপালিশ করা ধবধবে গায়ের রং, নির্মেদ শরীর। ত্রিশের একটু কমই হবে বয়স। তবে পাতার পোশাক নয়, পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, ফেডেড জিনস, পায়ে গ্রিপ দেওয়া জলপাই রঙা জুতো। সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আপনিই তো মিস্টার রঘুবীর মিশ্র?

রঘুবীর সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, হ্যাঁ। আপনি?

- উফ্ সেই কখন থেকে যে আপনাকে ফোনে চেষ্টা করছি। কিছুতেই পাচ্ছি না। এদিকে টাওয়ারের অবস্থা এত খারাপ, বারবার নট রিচেবল বলছে। আমি রজনীগন্ধা। আমার হোম স্টে আছে। পুষ্পা আমাকে ফোন করে বলল আপনার কথা। ওর ফোন পেয়েই চলে এলাম আপনাকে নিতে।

রঘুবীর স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, ও আচ্ছা। থ্যাংকস। নাইস টু মিট ইউ।

রজনীগন্ধা মিস্টি হেসে বলল, প্লিজ ফলো মি।

অভ্যস্ত কায়দায় রজনীগন্ধা তার ছিপছিপে শরীরটাকে নামাচ্ছে নুড়ি বিছানো খাড়াই পথ দিয়ে। পেছন পেছন সাবধানে নামছে রঘুবীর। একটু হাঁটার পর জঙ্গল শেষ হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর এল। ছোট দু'কামরার অফিসঘর ছাড়িয়ে এগোতে এগোতে রঘুবীর জিজ্ঞেস করল, আপনার হোম স্টে কি আপনি একাই রান করেন?

রজনীগন্ধা হাঁটছিল। পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমার একজন হেলপার আছে। পেমা চুকি। বড় জোর বছর কুড়ি বয়স হবে, কাজে তুখোড়। বাজারে যায়, সবজি কেটে মশলা বেটে রান্নায় আমাকে সাহায্য করে। পেমা চুকি আসছে না দু'দিন থেকে। ও থাকলে আমি ওকেই পাঠাতাম আপনাকে নিয়ে আসার জন্য।

রঘুবীর আলগা গলায় বলল, আসছে না কেন? অন্য কোথাও কাজ ধরেছে নাকি?

রজনীগন্ধা মুখ ফিরিয়ে বলল, সেসব নয়। আসলে বোধ হয় ওর শরীরটা খারাপ হয়েছে। সেদিন বলছিল গা হাত পা ম্যাজম্যাজ করছে। জ্বরজারি হয়েছে বোধ হয়। ওর ডেলিভারি হবার কথা সামনের মাসে। সে ব্যাপারেই আবার কোনও সমস্যা হল কিনা কে জানে! পেমাচুকি না থাকায় আমি বড্ড ঝামেলার মধ্যে পড়েছি।

একটা কাঠের দোতলা বাড়ি এল। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা জায়গা। প্রচুর মরশুমি ফুল সেই চত্বরে। বাঁশ দিয়ে মাচা বানানো আছে। সেখানে ঝুলছে লতানো গাছের স্কোয়াশ, বিন।

বাড়িটা দেখিয়ে রজনীগন্ধা বলল, এসে গিয়েছি আমরা।

টিনের সাইনবোর্ড গাছে ঝোলানো, থুলুংমাইলা হোম স্টে। বাড়িটা একেবারে নির্জন, নিস্তব্ধ।

রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে রজনীগন্ধা বলল, প্লিজ কাম।

কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে রঘুবীর দোতলায় উঠছে রজনীগন্ধার পেছন পেছন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নিচের খোলা জানলার দিকে চোখ চলে গেল একবার।

সাদা লেসের পর্দা টানা, তার ফাঁক দিয়ে মনে হল ঘর অন্ধকার করে কেউ শুয়ে আছে বিছানায়। মাছ পচা একটা ঘ্রাণের ঝলক এল নাকে। গন্ধটা নাক থেকে যেতে একটু সময় লাগল।

দোতলায় অ্যাটাচড বাথরুম সহ হাত পা ছড়িয়ে থাকার মতো ঘর। ঘরের দেওয়াল পাইনকাঠে মোড়া। দুধসাদা বিছানা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মোটাসোটা কম্বল পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখা। রুম ফ্রেশনারের গন্ধ ভাসছে সারা ঘরে। রজনীগন্ধা উৎসুক স্বরে বলল, ঘর পছন্দ হয়েছে?

- ফার্স্ট ক্লাস ঘর। এমন জায়গায় বেড়াতে এসে যে এত ভাল ঘরে থাকতে পারব সেটা ভাবতেও পারিনি।

- বারান্দায় আসুন। এখান থেকে পাহাড়ের খুব ভাল ভিউ পাওয়া যায়।

পাহাড়ি এলাকায় পড়ন্ত দুপুর থেকে সন্ধে গড়াতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। দূরের চুড়োগুলো এখন মেঘের আড়ালে। পাহাড়গুলো ডুবে যাচ্ছে গাঢ় তমিস্রায়। দূরে জটলা পাকানো খেলনাবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে।

রজনীগন্ধা বারান্দার রেলিঙে হাত রেখে বলল, ওই যে দূরের খুদে খুদে ঘরগুলো দেখছেন, ওটা দার্জিলিং। ওই যে নাক বরাবর খেলার মাঠ, ওটা পেডং। বাঁদিকে কোনে ওটা জোড়বাংলো। ডানদিকে দক্ষিণ সিকিমের নামচি। নামচির কাছেই রাবাংলা। রাবাংলা থেকে এই পিকগুলো আরও সুন্দর দেখা যায়।

এমন ফোটোজিনিক ভিউ দেখে লোভ সামলানো গেল না। চট করে ঘর থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে এল রঘুবীর। কয়েকটা ছবি পটাপট তুলে ভিউ ফাইন্ডারে ছবিগুলো দেখে ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, আপনি এই বাড়িতেই থাকেন?

- আমি আর আমার হাজব্যান্ড থাকি। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি চা নিয়ে আসছি।

মোবাইল বেজে উঠল। ফোন করেছে পুষ্পা। মেয়েটার দায়িত্ববোধ দেখে ভাল লাগল রঘুবীরের। পুষ্পা জিজ্ঞেস করল, কোনও অসুবিধে হয়নি তো? ঠিকমতো পৌঁছেছেন?

পুষ্পাকে এই লজে পৌঁছনর বৃত্তান্ত রঘুবীর জানাল দু'চার কথায়। পুষ্পা চুপ করে থাকল একটুক্ষণ। কিন্তু কিন্তু করে বলল, দাওয়াইপানিতে আরও একটা থাকার জায়গা আছে। কিন্তু ওদের এখন বুকিং আছে। তাই বাধ্য হয়ে রজনীগন্ধাকে ফোন করতে হয়েছে। অসুবিধে হলেও মানিয়ে নেবেন কষ্ট করে।

রঘুবীর বলল, এই ঘরটাও যথেষ্ট ভাল। স্পেস অনেকটা, বারান্দা থেকে দারুণ ভিউ পাওয়া যায়। দার্জিলিং, পেডং, রাবাংলা, জোড়বাংলো, সিকিমের নামচি সব দেখা যায়।

ফোনের ওপারে পুষ্পা শ্বাস টানল। কিছু বলতে গিয়েও বোধ হয় বলল না। ইতস্তত করে বলল, টেক কেয়ার স্যার।

পুষ্পার কথায় কী একটা ছিল, একটা কাঁটা ঢুকে গেল রঘুবীরের ভেতরে। পুষ্পা কি কিছু বলতে চাইছিল?

অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না রঘুবীর। পুষ্পা কী বলতে চাইছিল?

৮

পাহাড়ে এমন হয়। সূর্যের দেখা মেলে না দিনের পর দিন। কৃষবর্ণ মেঘ ঢেকে রাখে আকাশ। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় কেটে যায় সারাটা দিন। বিষন্ন এক আবিলতায় ঢেকে থাকে সমস্ত মন। একটু রোদ্দুরের জন্য হা পিত্যেশ করে বসে থাকে মন। কখন মুখ দেখা যাবে সূর্যদেবের!

সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে, অনন্ত শূন্যতার মধ্যে এতক্ষণ

স্থির হয়ে শুয়ে ছিল গ্রেগরি। আলো আসছে না একটুও। আলো আজকাল তার অসহ্য লাগে। চোখে আলো এসে পড়লে মনে হয় চোখদুটো বোধ হয় পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে গেল। দিনের বেলা সেজন্য নিজের ঘরে অন্তরীন হয়ে জানলা দরজা বন্ধ করে রেখে শুয়ে থাকে। ঘুমোতে চেষ্টা করে কিন্তু ঘুম আসে না। দিনের বেলাটুকু কষ্ট করে কাটিয়ে দিতে পারলে শান্তি। সূর্য ডোবার পর স্বস্তি ফিরে আসতে থাকে তার শরীরে। অন্ধকার যত ঘন হয় তত মনটা ভাল হতে থাকে গ্রেগরির।

শূন্যতা কেমন? মৃত্যু যেমন। মৃত্যু কেমন? মৃত্যু যেন একটা আরম্ভ হয়ে শেষ না হওয়া পথ। বন থেকে বনের মাথায়, জল থেকে জলে ওপরের শূনত্যায়। মৃত্যু আর ঈশ্বর যেন এক গোলাকার পথ। একটা পিঁপড়ে একবিন্দু থেকে রওনা হয়ে বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করে যেখানে শুরু করেছিল আবার সেখানেই এসে শেষ করছে। যে 'হ্যাঁ' দিয়ে শুরু করবে সে হ্যাঁ-তেই পৌঁছবে। যে 'না' দিয়ে শুরু করবে সে পৌঁছবে না-তে। ঈশ্বর তাই 'হ্যাঁ' এবং 'না'। শূন্যতাও তাই। এক অপার শূন্যতা এখন যেমন তাকে গ্রাস করে রেখেছে। ক্ষিতিকে যেমন ব্যোম, মেদিনীকে যেমন বরাহ, বসুন্ধরাকে যেমন সূর্য।

গ্রেগরি কাল সারাটা রাত কাটিয়েছে কবরখানায়। আজ ভোর রাতে এসে বিছানায় শুয়েছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। রজনীগন্ধা একবার এসে ডাকাডাকি করেছিল বোধ হয়। খাবার জন্য। খেয়েছিল কি কিছু? মনে পড়ে না। রজনীগন্ধার মুখটাও ক্রমশ ঝাপসা হতে শুরু করেছে মনের আয়না থেকে। সম্বিত ফিরে আসার পর আজ সারাদিন শুয়ে শুয়েই কেটেছে। কিছুটা সময় কেটেছে ঘুমিয়ে। কিছুটা সময় জেগে। কিন্তু কতক্ষণ ধরে এই বিছানায় শুয়ে আছে সেটা বলতে পারবে না।

গ্রেগরির আজকাল খিদে পায় না। তেষ্টাও পায় না। জৈবিক যে চাহিদাগুলো ছিল সেগুলো আর তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না। এসবের ওপরে উঠে গেছে সে। সে এখন আর আগের গ্রেগরি নেই। তার শরীরে আর প্রাণ নেই। কেন যেন তার মনে হয় সে একজন মৃত মানুষ। যে-মানুষ মৃত তার জৈবিক প্রবৃত্তি থাকার কথাও নয়। শুধু মনটা সবসময় বিষন্ন হয়ে থাকে। অনন্ত এক বিষাদের নদীর মধ্যে সবসময় শুয়ে থাকে গ্রেগরি।

মস্তিস্ক ভাল কাজ করে না গ্রেগরির। তবুও কখনও কখনও গ্রেগরি একটু চিন্তিত হয়। একটা ব্যাপারে তার সন্দেহ যায় না। রজনীগন্ধাকে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করেছে কিন্তু ঠিক ঠিক উত্তর পায়নি। গ্রেগরির প্রায়ই খটকা লাগে, সে কি আদৌ মৃত মানুষ? নাকি তার শরীরে প্রাণ আছে এখনও?

দাওয়াপানির এক চার্চের ফাদারের মুখে একবার শুনেছিল, মানুষ মারা যাবার পর প্রথম প্রথম বুঝতে পারে না যে সে মারা গেছে কিনা। প্রথমে নিজেকে স্বাভাবিক জীবন্ত মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু তারপর একটু একটু করে বোঝা যায় যে সে আর জীবিত নেই। তারও সম্ভবত সেই অবস্থা চলছে। স্মৃতি-বিস্মৃতির ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছে সে।

গ্রেগরি স্নান করে না দীর্ঘদিন। চুলদাড়ি কাটা বন্ধ কয়েক মাস ধরে। সে কারণেই হয়তো তার সমস্ত গায়ে একটা পচা আঁশটে গন্ধ। সাধারণ লোক সেই গন্ধ শুঁকলে কাছে আসে না। রজনীগন্ধা পর্যন্ত নাক কুঁচকোয়। কিন্তু এই গন্ধটাকে ভীষণ ভালবাসে গ্রেগরি। মনে হয় এটা স্বর্গের ফুলের গন্ধ। সেজন্য এই ঘ্রাণটাকে গ্রেগরি কিছুতেই নিজের থেকে আলাদা করতে চায় না। সব সময় বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়।

তবে গ্রেগরি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত। সে যদি জীবিত হয়ে থাকে, তার শরীরে যদি প্রাণ থাকেও তবে আর বেশিদিন তাকে জীবিত লোকেদের মধ্যে থাকতে হবে না। খুব তাড়াতাড়ি সমাপ্তি নেমে আসবে তার জীবনে। এই নশ্বর শরীরটার ধ্বংসের জন্য অস্থির হয়ে গেছে সে।

হবে না-ই বা কেন ! ওই যে রাস্তাটা লম্বা হয়ে দু'-মাথায় দুটো রাস্তার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, সে রাস্তায় ঢুকে সামান্য হাঁটলে ডানদিকে বেশ খানিকটা অঞ্চল জুড়ে বাঁশগাছের সারি আর কলাঝোপ। আর একটু দূরে ধুপিগাছের বন। তার উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কবরখানা। চারদিকে বড় বড় পাইন গাছের জটলা। ওখানেই তো শুয়ে আছে তার বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন। তার অপেক্ষায় রয়েছে তারা সকলে। মারা গেলে তাদের কাছে চলে যেতে পারবে সে। তার বাবা-মা কতটা খুশি হবে সেটা তো শুধু সে জানে।

এই সিমেটারিটা একসময় সাদা চামড়ার সাহেবরা ব্যবহার করত। স্বাধীনতার পর ব্রিটিশরা চলে গেছে দেশ ছেড়ে। এখন আর সাহেবসুবো নেই। এখন এই পাহাড়ে যে কয়েক ঘর অ্যাংলো আছে তারা গোর দেয় ওই গোরস্তানে। অন্যান্য দিনের মতো কালও সিমেটারিতে গিয়েছিল গ্রেগরি।

শ্মশানের সঙ্গে কবরখানার কোনও তুলনাই হয় না। শ্মশানের সবটাই এক গভীর শূন্যতা। মৃত মানুষের শরীরের কোনও চিহ্ন রাখে না শ্মশান। কিন্তু গোরস্তানের নিয়ম আলাদা। সেখানে বিরাজ করছে অশরীরীদের প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব। মনে হয় কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে মৃত মানুষেরা। শুধু একটা সোনার কাঠি ছোঁয়ানর অপেক্ষা। চিরঘুমন্ত মানুষগুলোর মাথায় রূপকথার সেই সোনার কাঠি ছোঁয়ালেই জেগে উঠবে তারা। চোখ খুলবে আবার, নড়েচড়ে বসবে।

সিমেটারিতে গ্রেগরি চুপচাপ বসে ছিল বাবাকে যেখানে গোর দেওয়া হয়েছে সেই কবরের পাশে। পাশেই মা-র কবর।

প্রথমে কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়। বিকেলের ছায়া ঘন হল, পশ্চিমদিকের ধুপি গাছের বনের মাথার ওপর দিয়ে সূর্য ডুবল। সন্ধে নামল এলাকা জুড়ে। পাহাড়ি জায়গা, তাই সন্ধে হতে না হতেই গাঢ় হল অন্ধকার।

তখন কবর ফুঁড়ে উঠে এসেছিল তার বাবা। বাপ-ব্যাটা দু'জনে মিলে সুখদুঃখের গল্প হল কিছুক্ষণ। একটু পরে নিজের কবর থেকে উঠে এল মা। তিনজনে অনেক কথা হল। ভোর রাতের দিকে ওরা আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজেদের কবরে। তখন শ্রান্ত শরীরে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল গ্রেগরি।

গ্রেগরির নিজের যে খটকা লাগে না তা নয়। তখন প্রশ্ন জাগে, সে যা দেখছে তা কি সত্যি কোনও ঘটনা? নাকি কোনও ভ্রম? হ্যালুসিনেশন? তার বোধশক্তি কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? মস্তিস্ক কি কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে? নইলে তার দিন আর রাতের হিসেব গন্ডগোল হয়ে যায় কেমন করে!

শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে স্মৃতিও ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। পুরনো কথা মনে পড়তে চায় না কিছুতেই। এই যে রজনীগন্ধাকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, বিয়ের পরেও ভালবাসত সম্পূর্ণ সত্ত্বা দিয়ে, সেই রজনীগন্ধার মুখটা পর্যন্ত ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

তবে সব কথাই যে সে ভুলে গেছে তা নয়। তার মস্তিস্কের কোষ থেকে সমস্ত স্মৃতি মুছে যাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে জ্বলা মশালের মতো স্থির জেগে রয়েছে সেই দিনটার

কথা। এখনও তো পেছন ফিরলে স্পষ্ট দেখতে পায় ফেলে আসা সেই দিনটাকে।

দাওয়াইপানি থেকে গাড়ি ভর্তি করে সমাবেশে যোগ দিতে গিয়েছিল অজস্র লোক। সেই রক্ত ঝরা দিনটার স্মৃতি তো এখনও আবছা হয়নি গ্রেগরির মন থেকে!

নিজেকে অচেনা লাগে। এই মৃতপ্রায় শরীরেও মৃদু কম্পনের সঞ্চার হয়। বোধ আচ্ছন্ন হয়ে আসে। চোখ ভিজে আসে জলে। গ্রেগরি অবাক হয়ে ভাবে, তার শুকনো চোখে এত জল আসে কোথা থেকে!

এমনিতে ইদানিং ঘুমোতে পারে না গ্রেগরি। পাশ ফেরে না, চিত হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা শুয়ে থাকে নির্জীবের মতো, কিন্তু ঘুম আসে না একটুও। ক্লান্ত হয়ে চোখ বোঁজে কখনও, আবার চোখ মেলেও রাখে অনেক সময়। এভাবেই জেগে থাকতে থাকতে একটা সময় তন্দ্রার মতো আসে। তখন ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু দৃশ্য ভাসে চোখের সামনে। তখন ওই একটা দৃশ্যই বারবার দেখে সে।

কখনও শুরু থেকে দৃশ্যের মিছিল চলে। পিজো গাড়ি চেপে একগাদা লোকের সঙ্গে তাদের দুজনের যাওয়া থেকে শুরু করে প্রথমে রাজেন সুনদাস, পরে তার বাবা ভিভিয়ানের গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া অবধি। কখনও আবার মাঝখান থেকে স্বপ্নটা শুরু হয়।

বিপ্লবের মশাল জ্বলার আগে তার প্রস্তুতির কাজ চলছিল পাহাড়ে। তপ্ত হচ্ছিল পাহাড়। বিক্ষোভ তীব্র হচ্ছিল মানুষের মনে। একের পর এক জনসভা হচ্ছিল, পথসভা হচ্ছিল পাহাড়ের আনাচে কানাচে। সরকারের বিরুদ্ধে পাহাড়ি মানুষগুলোর মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল তুমুল বিদ্বেষ। নেতারা ঘোষণা করল শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হবে অনশন। পালা করে করা হবে ভুখা হরতাল। জেহাদ ছাড়া দাবি আদায় হবে না।

তুষের আগুনের মতো পাহাড়বাসীর মন পুড়ছিল ধিকিধিকি করে। রক্তের আগুন জ্বলছিল শিরায় শিরায়। তারপর এল সেই অভিশপ্ত দিন।

সেদিনের ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলো আজও পরপর এসে দাঁড়ায় গ্রেগরির চোখের পাতায়। এখনও পরিস্কার দেখতে পায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে আগুনে বক্তৃতা দিচ্ছে নেতানেত্রীরা। তিন হাজার সমর্থকের জনসমুদ্র ফুঁসছে সেই ভাষণে। প্রশাসন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে ঘটনাস্থলে। পাহাড়ি পথের আঁকেবাঁকে দাঁড়ানো সারি সারি পুলিশের গাড়ি। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা বড় র‍্যাংকের সব অফিসার সতর্ক নজর রাখছে জনসভার দিকে। এর মধ্যেই হঠাৎ করে কিছু লোক ছুটে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল পুলিশের গাড়িতে। দাউদাউ করে পুড়তে লাগল পুলিশের জিপ।

বারুদ তৈরিই ছিল। এই হঠকারি কাজের পরিনাম হল সাংঘাতিক। জনতার ওপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলল নেতারা। মাইকে নেতারা চেষ্টা করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে কিন্তু কেউ কথা শুনছে না। জনতা তখন মারাত্মক উত্তেজিত। দেখতে না দেখতে আরও কয়েকটা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল কয়েকজন সমর্থক। পুলিশ বাধ্য হয়ে লাঠি চার্জ করতে শুরু করল।

পুলিশ ভেবেছিল জনতা পালিয়ে যাবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। না পালিয়ে পুলিশের দিকে ধেয়ে গেল জনতার এক অংশ। শুরু হল খন্ডযুদ্ধ। আন্দোলনকারীদের হঠিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পুলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাল। তাতেও পরিস্থিতির উন্নতি হল না।

ঠিক এমন সময় গুলির আওয়াজ শুনতে পেল গ্রেগরি। প্রথমে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সিংমারি থেকে আসা বছর পঁচিশেকের যুবক রাজেন, যার বিধবা মা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছিল গ্রেগরি আর ভিভিয়ান। তখন, ঠিক তখনই একটা গুলি এসে লেগেছিল ভিভিয়ানের পিঠে।

গ্রেগরি দেখতে পেল হাঁটু ভেঙে দুমড়ে পড়ে যাচ্ছে বাবা। সোয়েটারের বুকে ফুটে উঠেছে রক্তের আলপনা। ভিভিয়ানের মুখ হাঁ করা, দু'চোখে বিপুল শূন্যতা। পালাতে থাকা জনতা মাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বাবাকে।

দু'একজন বাবাকে পাঁজাকোলা করে ধরে নিয়ে এসেছিল নিরাপদ আশ্রয়ে। একজন সমর্থকের একটা মারুতি গাড়ি জুটে গেল। সেই গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ভিভিয়ানকে।

রক্ত পড়ছিল নিঃশব্দে। ধূসর সোয়েটার ভিজে যাচ্ছিল রক্তে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। বুক ধুকধুক করছিল ভয়ে। মনে মনে আশংকা হচ্ছিল পিঠ দিয়ে গুলিটা ঢুকে ফুসফুস আর হার্ট ফুটো করে দিয়েছে কিনা।

গাড়ি চলছিল পাহাড়ি আঁকাবাকা পথ দিয়ে। জমায়েতে আসা অজস্র গাড়িতে জ্যাম হয়ে গিয়েছিল ট্রাফিক। দেরি হয়ে যাচ্ছিল অহেতুক। বারবার ঘড়ি দেখছিল গ্রেগরি। ক্রমশ নিস্তেজ হতে থাকা ভিভিয়ানকে ছুঁয়ে রেখেছিল গ্রেগরি। সাহস যোগাচ্ছিল বারবার।

গ্রেগরির কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল ভিভিয়ান। ঢুলে পড়ছিল বারবার। 'কিছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি মনের জোর রাখো বাবা।' - বারবার করে বলছিল গ্রেগরি।

শুনেও যেন কিছু শুনতে পাচ্ছিল না ভিভিয়ান। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছিল ভিভিয়ান। নিভে আসছিল প্রাণ। দেখতে দেখতে একসময় স্থির হয়ে গেল তার চোখের মণি।

পুরো ঘটনাটা চোখের সামনে আরও একবার ঘটতে দেখল গ্রেগরি। সেদিন আগুন রঙা মেঘ করেছিল পাহাড়ের ঘন বনের মাথায়। মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা বিচ্ছুরিত সূর্যের রশ্মি ছোট্ট একটা সরলরেখার মতো এসে পড়েছিল ভিভিয়ানের স্থির হয়ে থাকা শরীরের ওপর। ভিভিয়ানের শরীর ছাড়িয়ে একটা কাঠের পাটাতনের মতো পড়ে ছিল রোদ।

গ্রেগরির মনে হচ্ছিল, ওটাই তার শূন্যতার পথ। ওটা ধরেই তার ভবিষ্যৎ জীবন চলবে এবার। স্পষ্ট থেকে অস্পষ্টে, ব্যক্ত থেকে কুয়াশায়।

৯

বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতি নিরীক্ষণ করছিল রঘুবীর। গরম চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হয়েছে রজনীগন্ধা। হেসে বলল, এখানে ফোনের টাওয়ার খুব ডিসটার্ব করে। বাড়িতে ফোন করে বলে দিয়েছেন তো?

সূর্যাস্তের রং থেকে ধার নেওয়া উষ্ণ তরলে আরামের একটা চুমুক দিল রঘুবীর। দিব্যি স্বাদ আর গন্ধ। আলগোছে বলল, আমি একা মানুষ। বাড়িতে ফোন করে জানাবার মতো কেউ নেই।

- আপনার ফ্যামিলি নেই?

- ছিল কোনও একদিন, এখন নেই। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রঘুবীর বলল, একটা মিসহ্যাপ হয়েছিল লেহ্-

লাদাখে ঘুরতে গিয়ে। আমি বাদে আমার ফ্যামিলির সবাই সেই দুর্ঘটনায় মারা যায়।

রজনীগন্ধা আন্তরিক গলায় বলল, ওহ ..আই অ্যাম সো সরি।

- নেভার মাইন্ড।

সামনে একটা রাস্তা লম্বা হয়ে দু'মাথায় দুটো রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। সেদিকে কিছু ঝোপ-জঙ্গল। তার আড়ালে সিমেন্টের অংশ উঁকি মারছে। চায়ের কাপটা রাখতে রাখতে রঘুবীর বলল, ওদিকটায় কী আছে?

- ওটা গোরস্তান। আগে শুধু ব্রিটিশরা ব্যবহার করত। এখন আমরা ব্যবহার করি। বাড়ির কেউ মারা গেলে ওখানে কবর দেওয়া হয়।

রঘুবীর চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, এখানে চার্চ আছে?

রজনীগন্ধা বলল, এই সিমেটারি রোডের শেষে একটা পুরনো গির্জা রয়েছে। সানডে-তে আমরা চার্চে যাই, মিস করি না পারতপক্ষে।

রঘুবীর রজনীগন্ধাকে দেখতে দেখতে খানিকটা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি যে ক্রিশ্চান সেটা আপনার নাম শুনে বুঝতে পারিনি।

রজনীগন্ধা একটু হেসে বলল, আমি নেপালি ব্রাহ্মণ। আমার বাবা-মা ছেত্রি। আমি জন্মসূত্রে হিন্দু। কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তিন পুরুষ ধরে ক্রিশ্চিয়ান। বিয়ের পর আমি ক্রিশ্চিয়ান হয়েছি। না-ও হতে পারতাম, হয়েছি নিজের মর্জিতে।

রঘুবীর ঘাড় নেড়ে বলল, ও আচ্ছা।

রজনীগন্ধা রঘুবীরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ধর্ম বদলালেই নাম বদলাতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। আমার নাম রোজি বা রোজমেরিও হতে পারত। কিন্তু আমার নাম বদলাতে ইচ্ছে হয়নি।

রঘুবীর বলল, রজনীগন্ধা নামটা অনেক বেশি সুন্দর। অন্তত আমার কাছে।

রজনীগন্ধা আলগা গলায় বলল, সবাই বলে ব্যাকডেটেড নাম।

রঘুবীর হাসল, রক্তগোলাপের সৌন্দর্য রাজকীয়। তাছাড়া গোলাপ, বিশেষ করে লালগোলাপ হল প্যাশনের প্রতীক। গোলাপ ফুলের লাল রংয়ে মিশে আছে উচ্ছ্বাসের রং, সম্ভোগের রং। কিন্তু গোলাপের একেবারে একশো আশি ডিগ্রি উল্টোদিকে রজনীগন্ধার আবস্থান। রজনীগন্ধার নম্র আবেদন একেবারেই অনন্য। নিরুচ্চার পবিত্রতার অন্য নাম রজনীগন্ধা।

কথাটা বলেই মনে হল একটু প্রগলভতা হয়ে গেল। রঘুবীর কথা ঘুরিয়ে বলল, আপনাদের এই জায়গার নামটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত। এমন নামের কোনও কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। সেটা কী?

রজনীগন্ধা বলল, এখান থেকে কিলোমিটার চারেক নিচে রয়েছে এক ঝোরা। বহু বছর আগে চা বাগানের বাঙালি এক ম্যানেজার ঘোড়ায় চড়ে এরিয়া ভিজিট করছিলেন। ক্লান্ত হয়ে তিনি ওই ঝরনার জল খান, ধুয়ে নেন হাত-পা। তাতেই মাত্র কয়েকদিনে সেরে যায় ভদ্রলোকের পায়ের পুরনো ঘা। সেই মিস্টার ঘোষই এই গ্রামের 'দাওয়াইপানি' নাম দিয়েছিলেন।

রঘুবীর বলল, এই গ্রাম এখন একদম ভার্জিন। কিন্তু লোক দাওয়াইপানির নাম জানতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে পপুলার হবে জায়গাটা, ট্যুরিস্ট আসতে শুরু করবে দূর দূর থেকে। এই করতে করতে মেলা বসে যাবে একদিন। তখন পর্যটনের ব্যবসা জমে উঠবে ঠিকই কিন্তু এই সৌন্দর্য আর থাকবে না।

- কথাটা খুব ভুল বলেননি আপনি। রজনীগন্ধা মাথা নাড়িয়ে বলল।

রঘুবীর একগাল হেসে বলল, যাক গে ওসব ছাড়ুন। বলুন আজ রাতে কী খাওয়াচ্ছেন ?

রজনীগন্ধা হাসল, ভাত, ডাল, আলুভাজা আর মুরগির মাংসের ঝোল। সঙ্গে রাইশাক, পুদিনা, বাঁধাকপি আর ক্যাপসিক্যাম দিয়ে একটা লোকাল প্রিপারেশন। কী চলবে তো?

- খাওয়া যায় এমন কোনও জিনিসেই আমার অসুবিধে নেই। রঘুবীর বলল, আপনার এই বারান্দাটা দেখে খুব লোভ হচ্ছে। সন্ধেবেলা এখানে বসে একটু ড্রিংক করা যাবে তো?

রজনীগন্ধা বলল, এসব দিকে নভেম্বর থেকে রাতে বেশ ভাল কুয়াশা পড়তে শুরু করে। সঙ্গে শীত থাকে মারাত্মক। কাজেই রাতের দিকে বারান্দায় বসবেন না। চট করে ঠান্ডা লেগে যাবে। আপনি ঘরে বসেই ড্রিংক করুন, অসুবিধে নেই, কিন্তু দেখবেন কোনও ন্যুইসেন্সি যাতে না হয়। এখানে ডিনারের টাইম সাড়ে আটটা। তার আগেই ড্রিংক শেষ করবেন।

রজনীগন্ধার শেষ কথাটার মধ্যে একটা অনুচ্চ নির্দেশ ছিল কি ? রঘুবীর দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না।

রজনীগন্ধা চলে গেল নিচে। কিচেন থেকে খুটুর খুটুর শব্দ এল একটু। রাতের রান্নার আয়োজন চলছে বোধ হয়।

বারান্দায় বসে এদিক ওদিক দেখছিল রঘুবীর। সবুজ প্রকৃতির রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঈশ্বর রংতুলি নিয়ে যেন বসে আছে আড়ালে। সূর্য ডুবেছে একটু আগে। কালো তুলি দিয়ে সবুজ গাছপালার ওপর কালো রংয়ের পোঁচ ফেলছেন ঈশ্বর। মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে সফেদ কুয়াশা। সন্ধে যত ঘন হচ্ছে ঠান্ডাটা জোরদার হচ্ছে ক্রমশ।

একটা সিগারেট ধরাল রঘুবীর। ধোঁয়া ছাড়ছে আনমনে। ক্যামেরাটা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের ছবি নেবার চেষ্টা করল একটুক্ষণ। ভিউফাইন্ডারে তাকিয়ে দেখল সিগারেট টানতে টানতে। এদিকে হাওয়া দিচ্ছে কনকনে। গা শিউরে উঠছে হিমেল হাওয়ায়।

সোমনাথ ফোন করেছে রঘুবীরকে। কুশল জিজ্ঞাসা করে বলল, দাওয়াইপানিতে পৌঁছে গেছেন তো ঠিকঠাক? রঘুবীর দু'চার কথায় উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল হাসপাতালের কথা। সোমনাথ হেসে বলল, সব ঠিক আছে। দুর্গাপুজো গেছে সবে। এই সময়টায় হাসপাতালে রুগির ভিড় একটু কম থাকে। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই। আপনি হাসপাতাল নিয়ে একদম ভাববেন না।

ফোনে যখন রঘুবীর কথা বলছিল তখন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসেছে রজনীগন্ধা। একটা প্লেটে পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, শসা দিয়ে স্যালাড বানিয়ে নিয়ে এসেছে। মুখে কিছু বলল না। হাত দিয়ে প্লেটটা ইশারা করে দেখিয়ে প্লেটটা রেখে দিয়ে চলে গেল আবার।

বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে এল রঘুবীর। গাড়িতে করে এখানে আসার সময় একটা কার্শিয়াং থেকে ক্যালিপসো রাম নিয়ে এসেছিল রঘুবীর। বোতলটা বের করে বড় একটা পেগ বানিয়ে গ্লাসে ঢালল। ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। বেশ

লাগছে। শরীরের শ্রান্তি যেন একটু একটু করে উবে যাচ্ছে।

ঘরটার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখছিল রঘুবীর। কাচের শার্সির ওপারে চোখ গেল একবার। অন্ধকার কবরখানাটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

তিন পেগ শেষ করার পর মাথাটা রিমঝিম করতে শুরু করল। ঠিক তখনই চোখে পড়ল দৃশ্যটা। একটা আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সিমেটারি রোড দিয়ে!

চোখ রগড়ে ভাল করে দেখল আবার। টর্চের আলো যেমন হয় ঠিক তেমন একটা হলদেটে আলো যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে কবরখানার পথে।

নেশার ঘোরেও চমকে উঠল রঘুবীর। কী হল ব্যাপারটা! ভূতের চোখ নাকি? আলেয়া টালেয়া নয়তো? গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে রঘুবীরের।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রঘুবীর। চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। নাহ্ আলোটা আর জ্বলছে না। নিভে গেছে।

মাথাটা একটু ঘুরে গেল। নেশার ঘোরে ভুল কিছু দেখল নাকি ?

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বেশ কিছুক্ষণ কাটল। আর ভৌতিক কিছু দেখতে পাওয়া গেল না। চারদিক অন্ধকার আবার। চার নম্বর পেগ শেষ করে ফেলল দু'চুমুকে। একটু আগে যে দৃশ্যটা দেখেছে সেটাই মনে মনে ভাবছিল রঘুবীর। তালগোল পাকিয়ে গেছে মাথার ভেতরে। রঘুবীর ভূত কখনও দেখেনি। তার এতদিনের অতৃপ্ত বাসনা কি পূর্ণ হল আজ?

কতক্ষণ যে কেটেছে এভাবে জানে না রঘুবীর। রজনীগন্ধার গলা শুনতে পেল। খাবার জন্য ডাকছে নিচ থেকে।

শরীরটাকে তুলল রঘুবীর। নেশাটা একইরকম আছে এখনও। কাঠের সিঁড়ির রেলিং ধরে নিচে নামতে নামতে দাঁড়িয়ে পড়ল একবার। মদের ঘোরের মধ্যেও মনে হল নাকে এসে সেই মাছপচা গন্ধটা ঝাপটা মারল যেন।

বসতবাড়ির সঙ্গে লাগোয়া গোল কাঠের ঘর। সিমেন্টের মেঝে। ওপরে টিনের চাল। সেখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা। খাওয়া শেষ করে বেসিনে হাত ধোবার সময় সৌজন্য দেখিয়ে রঘুবীর জিজ্ঞেস করল, আপনি খেলেন না?

রজনীগন্ধা এমন করে মাথাটা দোলাল যার অর্থ হ্যাঁও হয় না-ও হয়।

রঘুবীর হাত মুছছিল বেসিনের পাশে রাখা ধবধবে একটা তোয়ালেতে। বলল, আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তো আলাপ হল না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখলাম কেউ শুয়ে আছে নিচের ঘরটায়। উনিই আপনার হাজব্যান্ড তাই না?

রজনীগন্ধা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

রঘুবীর জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোক দেখছি শুয়ে আছেন তো শুয়েই আছেন দুপুর থেকে। গলার আওয়াজ পেলাম না একবারও। ওঁর কি শরীরটা খারাপ?

রজনীগন্ধা রঘুবীরকে জরিপ করছে তীক্ষ্ণ চোখে। কেমন একটা গলায় বলল, পুষ্পা কিছু বলেছে আপনাকে?

রঘুবীর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, না। কেন বলুন তো?

রজনীগন্ধার জড়ো হওয়া ভুরু খানিকটা সোজা হল। ঠোঁট চেপে বলল, ওর নাম গ্রেগরি। হি ইজ আ টিচার। গ্রেগরি একটু অসুস্থ। তাই ছুটি নিয়েছে কিছুদিনের জন্য। স্কুলে যাচ্ছে না।

রঘুবীর গলায় উদ্বিগ্নতা ফুটিয়ে বলল, একে পাহাড়, পাশেই জঙ্গল। এদিকের মশা তো রাক্ষুসে সাইজের। ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গি জাতীয় কিছু হয়নি তো? রক্ত পরীক্ষা করিয়েছেন?

- ছ'মাইলের ওদিকে একজন কবিরাজ আছে। সে চিকিৎসা করছে। বলেছে কেউ বাণ মেরেছে ওকে।

- বাণ মেরেছে মানে?

রজনীগন্ধা ছেলেভোলানো হাসি হাসল, ও আপনি বুঝবেন না।

রঘুবীর গলায় ঈষৎ বিরক্তি মিশিয়ে বলল, কেন বুঝব না? বললেই বুঝব।

রজনীগন্ধা একটা হাই তুলে বলল, কাল বলব। যান শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

রঘুবীরের মধ্যে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। রজনীগন্ধার কাঁধে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে রঘুবীর বলল, লুক হিয়ার, আই অ্যাম আ ডক্টর। আপনার হাজব্যান্ডের সমস্যাটা আমাকে বলুন।

রজনীগন্ধা রঘুবীরকে দেখল একপলক। কাঁধ ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, আপনি দোতলায় যান। আমি বাসনকোসন গুছিয়ে রেখে আসছি।

রঘুবীর বেসিনে গিয়ে মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিল আবার। টাল্লি ভাবটা আছে একটু। তবে নেশাটা আগের মতো প্রগাঢ় নেই আর।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসেছে রঘুবীর। বিছানায় বসে ল্যাপটপটা ঘাঁটছিল। তার মধ্যেই সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ।

রজনীগন্ধা পোশাক বদলে এসেছে। নাইটির ওপর গোলাপি উলের একটা চাদর জড়ানো। ল্যাপটপ বন্ধ করতে করতে রঘুবীর বলল, বসুন।

রজনীগন্ধা রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ডাক্তার ?

রঘুবীর একটা শ্বাস ফেলল। গম্ভীর গলায় বলল, এই রাজ্যের চারদিকে আজকাল যেমন ঝুরি ঝুরি ফেক ডাক্তার ধরা পড়ছে আমি তেমন নই। আমি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার। আপনার হাজব্যান্ডের সমস্যাটা আমাকে খুলে বলুন। আমি আপনার কোনও উপকারে লাগতেও পারি।

রজনীগন্ধা একটা চেয়ারে বসল ধীরেসুস্থে। তারপর বলল, বলছি।

রজনীগন্ধা নিজেকে গুছিয়ে নিল। তারপর বলল, গ্রেগরিরা বড়লোক না হলেও স্বচ্ছল। ওদের সামান্য খেতিজমি আছে। গোয়ালে গরু আছে কয়েকটা। আগে বেডফোর্ডের ট্রাকে করে এই বাড়ি থেকে প্রতিদিন ঠিকাদারেরা দুধ নিয়ে যেত, পৌঁছে দিত দার্জিলিংয়ে। আমার শ্বশুর এসব দেখতেন।

রঘুবীর বলল, দুধের ব্যবসা থাকলে তো ভালই। মাস গেলে মোটামুটি একটা রোজগার তো চলে আসে এই ব্যবসা থেকে।

রজনীগন্ধা বলল, শুধু দুধ নয়। দুধ ছাড়াও খেতের সবজি বিক্রি হত। আমার শ্বশুর চাকরি করতেন একটা স্কুলে। ওঁর নাম ভিভিয়ান। ওঁর রিটায়ারমেন্টের পর গ্রেগরি সেই চাকরিটা পেয়ে যায়। এদিকে এমনটাই নিয়ম। বছর খানেক আগে আমার শ্বশুরমশাই মারা গিয়েছিলেন পুলিশের গুলিতে।

রঘুবীর বিস্মিত হয়ে বলল, পুলিশের গুলিতে? উনি কি পাহাড়ের আন্দোলনের অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন?

রজনীগন্ধা বলল, একেবারেই না। গ্রেগরি আর ওর বাবা

মোটেই অ্যাক্টিভিস্ট নয়। গ্রেগরি তবুও জনসভায় যেত ভয়ে ভয়ে। কিন্তু আমার ফাদার ইন ল' ভিভিয়ানের ওসবে অ্যালার্জি ছিল। পারতপক্ষে যেত না কোথাও। দার্জিলিং বর্ডারে আন্দোলন চলছিল। ভিভিয়ানের মোটেই যাবার ইচ্ছে ছিল না। লোকাল লিডারের হুইপ ছিল প্রত্যেক বাড়ি থেকে দু'জন পুরুষকে সমাবেশে যেতেই হবে। যাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল নেতারা।

- সে তো বুঝলাম। কিন্তু সেদিন কী হয়েছিল জমায়েতে? পুলিশ হঠাৎ গুলি চালাল কেন?

রজনীগন্ধা বলল, সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই অঞ্চলের অন্যান্য লোকেদের মতো সমাবেশে পৌঁছেছিল গ্রেগরি আর ভিভিয়ান। সেখানে পরিস্থিতি হঠাৎ করে গরম হয়ে ওঠে। সাত রাউন্ড পুলিশের গুলি চলে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সে সময় ভিভিয়ানের পিঠে গুলি লাগে। হাসপাতাল নিতে নিতে ভিভিয়ানের মৃত্যু হয়। ভিভিয়ানের মৃত্যুর পর থেকেই গ্রেগরি বদলে যেতে থাকে। ভেবে নিতে থাকে যে ওর বাবার মৃত্যুর জন্য ও নিজেই দায়ী। সেদিন ও ওর বাবা ভিভিয়ানকে জমায়েতে যাবার জন্য জোরজার না করলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটত না।

- তারপর?

রজনীগন্ধা বলল, সেই ঘটনার পর থেকেই গ্রেগরি কেমন যেন হয়ে যেতে থাকে। সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে। ওর মনের যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যে ও এতটা বদলে যাবে সেটা ভাবিনি। আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে না, স্নান করে না, খায় না, সারাদিন ঘর বন্ধ করে শুয়ে থাকে বিছানায়। সন্ধে হলে চুপচাপ বেরিয়ে যায় বাইরে।

রঘুবীর কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল, কোথায় যায় ?

রজনীগন্ধা ইতস্তত করে বলল, সিমেটারি রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় কবরখানায়। ওর মা মারা গিয়েছিল অনেক বছর আগে। ওর বাবা আর মায়ের কবর পাশাপাশি। সেখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে গ্রেগরি। একা একা হাসে। কথা বলে। আমি কয়েকদিন ওর পিছু নিয়ে দেখেছি। অন্য কোথাও যায় না গ্রেগরি।

- ওকে জিজ্ঞেস করেননি কিছু?

রজনীগন্ধা হঠাৎ হেঁচকি তুলে কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, করেছি। উত্তর দেয় না। মুখের দিকে অবোধ বাচ্চার মতো করে তাকিয়ে থাকে।

রঘুবীর একটু চিন্তা করে বলল, আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন আগে?

রজনীগন্ধা বলল, বছর পাঁচেক হবে। আমাদের বিয়ে নিয়ে খুব উৎসাহী ছিল ওর মা। কিন্তু আমাদের বিয়ের দিন একটা কান্ড ঘটে। চার্চের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাক হয় ওর মায়ের। ওখানেই শেষ। আমার স্বামী বরাবরই একটু আবেগপ্রবণ। ওর মায়ের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন চুপচাপ ছিল গ্রেগরি। একা একা থাকত।

- আর আপনার শ্বশুর? তিনি কেমন মানুষ ছিলেন?

- আমার শ্বশুর অনেক শক্ত মনের মানুষ। বউয়ের অন্ত্যেষ্টি হয়ে যাবার এক সপ্তাহ পর থেকেই স্কুলে গেছেন পড়াতে। কিন্তু গ্রেগরির ব্যাপারটা একদম আলাদা। মায়ের মৃত্যুটা সামলে উঠতে পারলেও বাবার বেলায় একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সবসময় বিষন্ন মুখ করে বসে থাকত। স্কুল যেত না। আমি অনেক বোঝালেও বুঝত না। সমস্যাটা বাড়তে শুরু করল গত দু'মাস ধরে।

রঘুবীরের নেশা ছুটে গেছে। ডাক্তারি সত্ত্বা জেগে উঠেছে এবার। ঠোঁটে কামড় দিয়ে কিছু চিন্তা করে বলল, গত দু'মাস ধরে কী হচ্ছে?

রজনীগন্ধা ভেঙে পড়া মানুষের মতো গলায় বলল, যত দিন যাচ্ছে তত ঘরবন্দি হয়ে পড়ছে গ্রেগরি। আজকাল সারাদিন চুপচাপ শুয়ে থাকে। স্নান-খাওয়া বন্ধ। চুলদাড়ি কাটে না, দাঁত অবধি মাজে না। সারা গা দিয়ে পচা গন্ধ বেরোয়, কাছে যাওয়া যায় না। লোকের সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

রঘুবীর নড়েচড়ে বসে বলল, কী আশ্চর্য এ তো মানসিক রোগ! ওকে ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন?

- ওই যে বললাম তখন। অনেক দূর থেকে একজন কবিরাজ নিয়ে আসছি সপ্তাহে সপ্তাহে। সে ঝাড়ফুঁক করছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না কিছু। অনেক টাকা জলে চলে গেল এই ক'মাসে।

- সারাদিন কী করে আপনার হাজব্যান্ড?

- বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে থাকে। কথা বলে না, ওঠে না, পাশ পর্যন্ত ফেরে না। জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে বোঝা যায় না। তবে সন্ধে ঘন হলে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। হেঁটে হেঁটে সিমেটারি রোড ধরে গ্রেভইয়ার্ডে চলে যায়। সকাল হলে এক-একদিন ফিরে আসে বাড়িতে। কোনওদিন আবার আসেও না।

- দাওয়াইপানির লোকজন কী বলে? তারা কি জানে গ্রেগরির ব্যাপারটা?

- সিমেটারি রোডে রাতের বেলা টর্চের আলো দেখে লোকে আগে ভাবত ভূত-প্রেত কিছু। তবে এখন জেনে গেছে সব।

- নেতারা কী বলছে? তারা গ্রেগরির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি কিছু?

- রোহিত থাপা নামে একজন লোকাল লিডার আছে। সে প্রথম প্রথম কয়েকদিন এসেছিল। এখন আর আসে না। দাওয়াইপানিতে শুনতে পাই ছ'মাস আগে রোহিত সমেত বেশ কয়েকজন নেতাকে হাবিজাবি কেস দিয়ে পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর লক আপে ওদের প্রচন্ড মার মেরেছে। রোহিত তো বেরোবার পর সোজা হয়ে হাঁটতে পারেনি কয়েক মাস। যেসব নেতাকে ধরেছিল পুলিশ তারা সব এলাকাছাড়া। শুনেছি রোহিত এখন শিলিগুড়িতে থাকে।

- রোহিতকে পুলিশ ধরল কেন?

রজনীগন্ধা চেয়ার ছেড়ে উঠল। একটু থমকে থেকে বলল, অত শত জানি না। তবে এটা বুঝি যে পলিটিক্সের ব্যাপার অনেক জটিল। আমাদের ছোট মাথায় অত কিছু ঢুকবে না।

রঘুবীর ভাবছে আনমনে। গ্রেগরির স্মৃতিঘর কি এখন মাকড়সা-জাল বাড়ির মতো একেবারেই ঝাপসা হয়ে গেছে? যেখানে ঘরের ভেতর ঘর, তার ভেতর ঘর। খানিকটা ছায়া, খানিকটা আবছায়া। মায়াবী রহস্যমাখা পোড়ো বাড়ি যেমন হয়। এই পোড়ো বাড়ির অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে অন্দরমহল থেকে গ্রেগরিকে কি বের করে আনা যাবে আর?

রঘুবীর আশাবাদী। মেঘে মেঘে বেলা শেষ হলেও ভেতরের সমস্ত আকাঙ্খাগুলো পড়ন্ত বিকেলের মতো যেন ডালপালা বাড়িয়ে বলে, সূর্য অস্ত যায়নি এখনও। শেষ রোদ্দুরের আলো নিভতে বাকি আছে একটু। অন্ধকারে অস্তিত্ব ডুবে যাবার সময় আসেনি। মেঘ ভেঙে রোদ উঠবেই। আজ না হোক, কাল।

রঘুবীর উঠে দাঁড়িয়ে রজনীগন্ধার কাঁধে হাত রেখে বলল, আমার সঙ্গে গ্রেগরির একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারা যাবে?

রজনীগন্ধা ভুরু তুলে বলল, কেন বলুন তো?

- আমি একটু কথা বলে দেখতে চাই। তেমন বুঝলে আমি আমার সাইকোলজিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব। আমার বিশ্বাস গ্রেগরি আবার ভাল হবে।

১০

ভোররাত অবধি কবরখানায় ছিল গ্রেগরি। শরীরটা ঠিক নেই। মাথা প্রচন্ড ব্যথা। গায়ে একটু জ্বর জ্বর ভাব। এমনিতে খিদেবোধ নেই কিন্তু এখন পেটটা যেন কেমন কেমন করছে। থেকে থেকে পাকিয়ে উঠছে পুরো শরীরটা।

আজ আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না গ্রেগরির। কবরখানা থেকে বাড়ি না ফিরে একটু অন্যদিকে এসেছে হাঁটতে হাঁটতে। এই জায়গাটার নাম দেওরালি।

ভোরের আলো ফুটেছে। চারদিক ঝকঝক করছে সেই সোনা আলোর রেণু লেগে। একদিকে নদী। অন্যদিকে সিঁড়ি সিঁড়ি রং বেরংয়ের চাষের জমি। কোনওটা সাদা ফুলে ভরা তো কোনওটা হলদে। একটা জায়গায় সাদা, হলদে গুরাসের ছড়াছড়ি। ভেতরে লালের আলপনা।

মাটি থেকে একটা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ঘ্রাণ নিল গ্রেগরি। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। আবার বড় করে শ্বাস নিল। কয়েকবার করতেই মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। অসাড় হয়ে যাচ্ছে স্নায়ু। এই ফুলগুলোর মজাই এই। একটুক্ষণ ঘ্রাণ নিলেই মাথা ধরে যায়।

পাহাড়ের গায়ে কোথাও কলাবন, কোথাও বাঁশগাছের সারি, কোথাও এলাচের ঝোপ। সবুজ ঘাসের কার্পেটে তির তির করে বয়ে চলা এক জলধারা। এটাই দেওরালি। দেবতার পদচিহ্ন। দেবতারা এখানে নেমে আসে এই বিশ্বাসে এই স্থান কেউ অপবিত্র করে না।

উবু হয়ে জলের ধারে বসল গ্রেগরি। স্মৃতি তার সঙ্গে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এ যেন গভীর এক ক্ষত। শত মলম দিলেও শুকোয় না কিছুতেই। দেওরালির অপার্থিব প্রকৃতি দেখতে দেখতে একটা শ্বাস ফেলল গ্রেগরি।

পাহাড়ের অপার রূপের বাহার সেই এক আছে। থাকবেও। কিন্তু গ্রেগরির ভেবে অবাক লাগে যে পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বদলে গেল সবকিছু।

টুকরো টুকরো ঘটনার মালা দিয়ে গাঁথা হচ্ছিল পাহাড়ের আন্দোলনের রূপরেখা। দলের মধ্যে রক্তক্ষরণ চলছিল। দুটো বা তিনটে দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল মূল দলের মধ্যে। রেষারিষি চলছিল নিজেদের মধ্যে। শীর্ষনেতাদের মধ্যে কেউ কেউ পিছিয়ে পড়ছিল, পিছন সারি থেকে কেউ কেউ আবার চলে আসছিল সামনে। চোরাগোপ্তা মারামারি আর খুনোখুনি চলছিল দিনরাত। তার মধ্যেই এক বড় লিডার খুন হয়ে গেল হঠাৎ করে। ওদিকে সেদিনের সেই ঘটনায় কয়েকজন নিরীহ লোকের মৃত্যু হল। পাহাড়ের আন্দোলনে এক নতুন বাঁক এল।

পুকুরে একটা ঢিল ছুঁড়লে প্রথমে কিছুক্ষণ ঢেউ ওঠে। পরে সেই ঢেউ মিলিয়ে যায়। এই ঘটনার পরেও তাই হল। পাহাড়ের আনাচ কানাচ থেকে উঠে এল মাতব্বরদের দল। রোহিত থাপাকে কোনও অজানা কারণে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল থানায়। শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য উঠে এল ভুঁইফোর কিছু তরুণ নেতা। কেউ এই গ্রামের লোক। কেউ পাশের গ্রামের।

সেদিন দাওয়াইপানির প্রায় সবাই সেদিন গিয়েছিল সমাবেশে যোগ দিতে। ভিভিয়ান, গ্রেগরি, ভাইলাদের মতো প্রায় সব পুরুষ। দু'-চারজন যেতে পারেনি, নিজের নিজের কিছু কাজ থাকায়। কিন্তু সেটা মানতে রাজি নয় এই ভুঁইফোঁড় মাতব্বররা। সেদিন সমাবেশে যায়নি এমন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাকে সবার সামনে কান ধরে ওঠবস করিয়েছে তারা। এই অপমান ভাল মনে নিতে পারেনি কেউ। তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে দাওয়াইপানি জুড়ে। বোঝা যাচ্ছে আন্দোলনের রাশ নেতৃত্বদের হাত থেকে আলগা হচ্ছে ক্রমশ।

গ্রেগরির এখন মনে হয়, ভিভিয়ান ঠিকই বলত, যে পথে পাহাড়ের আন্দোলন চলছে সে পথে মাতব্বরদের উত্থান অনিবার্য। কেননা গোড়াতেই আছে গলদ। সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নে নেতারা বলে, জনতাই ইতিহাস তৈরি করে, তারাই শেষ কথা বলবে। নিজের দাবি আদায়ের প্রশ্নেও সেই কথা। কিন্তু আবার সেই লোকগুলোই এক নিঃশ্বাসে বলে, দলই সব কিছু নির্ধারণ করবে। তখন কার্যক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা গৌন হয়ে যায়। দলই হয়ে যায় শেষ কথা। কিন্তু দলের কি নিয়ন্ত্রণ থাকে সব সময় ? থাকে না। এখানেও তাই হল। দলে ভাঙন ধরল। কিছু নেতা যোগ দিল অন্য শিবিরে। মাঝখান থেকে ভিভিয়ানের মতো কিছু সাধারণ মানুষের প্রাণ চলে গেল অকারণে।

নদীর জল দিয়ে মুখটা একটু ধুতে পারলে আরাম লাগত হয়তো। কিন্তু গ্রেগরির ইচ্ছে করল না। জল দেখলেই ইদানিং কেমন অস্থির অস্থির লাগে গ্রেগরির। বহুদিন হয়ে গেল স্নান অবধি করে না গ্রেগরি। শৌচকর্ম করার সময়েও জলের ব্যবহার করে না। তার ফলে সমস্ত শরীরে বাসা বেঁধেছে বদগন্ধ। কিন্তু সেই বিশ্রী ঘ্রাণটাকেই নিজস্ব বলে ধরে নিতে ভাল লাগে গ্রেগরির। দু'দিনের বাসি মড়ার গন্ধ এমনই তো হয়।

দাওয়াপানির থেকে খানিকটা দূরে ঘন বন। এত নিবিড় যে গাছের ডালপালা ভেদ করে সূর্যের আলো মাটিতে পড়ে না। বুনো জীবজন্তুও আছে নানা রকম। দিনের বেলাতেও সেই জঙ্গলের মধ্যে লোকজন যায় না। মাঝেমধ্যে সেই অরণ্যে গিয়ে গাছের ছায়ায় একটু চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে গ্রেগরি। কেউ এসে বিরক্ত করে না।

ক্লিষ্ট অশক্ত শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে দাওয়াপানি ফরেস্টের দিকে নিয়ে যেতে লাগল গ্রেগরি।

১১

ঘুমের মধ্যে একটা কাঁটা তারের বেড়া দেখতে পেল রঘুবীর। আকাশ জমিনের মাঝ বরাবর। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম। ক্ষিতিতে নিজেকে আটকে রাখলে চলবে না। ক্ষিতির বেড়া পার করার পর এল অপ্। এখানেই তো জলের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা! ঠিক তাই। কাঁটা তারের বেড়া পেরিয়ে সন্ধান পাওয়া গেল একটা নদীর। বসুন্ধরার ক্ষেতের ফসল সামলাচ্ছে এক কাকতাড়ুয়া। কাকতাড়ুয়ার মুখে সাদা রং করা গোল হাঁড়ি বসানো। মুখের আদলটা খুব চেনা চেনা। ওটা গ্রেগরি না!

সাড়ে চারটের সময় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। বিছানার মায়া ছেড়ে বারান্দায় এল রঘুবীর। এসেই দস্তুরমতো অবাক।

অন্ধকার পাহাড়ের দিকে একসঙ্গে অনেকে আঁজলা ভরে ছুঁড়ে দিচ্ছে লাল রংয়ের আবির। স্পষ্ট হচ্ছে লাল ওড়নায় মুখ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

পাখির ডাক কানে আসছে। আড়মোড়া ভাঙছে পাহাড়ি অরণ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশে আরও দুই শৃঙ্গ, পান্ডিম আর কাবরু জেগে উঠছে রাতের কুহেলি সরিয়ে।

নিচের দিকে চোখ চলে গেল। টুকরো টুকরো মেঘ পাহাড়ি ঠান্ডায় জমে গিয়ে যেন শক্ত সাদা বরফের আকার নিয়েছে। তারও নিচে ফিতের মতো দেখা যাচ্ছে রঙ্গিত নদী। এমন দৃশ্য দেখবে বলেই তো সে এসেছে দাওয়াইপানি নামের এই অচেনা পাহাড়ি স্পটে।

কম্বল গায়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ক্যামেরাটা বের করে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রাখল রঘুবীর। সদ্য পরিণীতার সিঁদুরের টিপের মতো বর্তুলাকার সূর্যের ছবি তুলল কয়েকটা। সাধ মিটল না। প্রকৃতির অপার্থিব মেজাজটা এক শতাংশও এল না।

প্লে ব্যাক করে ফোটোগুলো দেখে নিল একটু। কিস্যু হয়নি। মেজাজ চটকে গেল। একটু পরেই সূর্যটা টুপ করে লাফ দিয়ে উঠে যাবে অনেকটা ওপরে। তখন আর এই মাহেন্দ্রক্ষণ থাকবে না।

নতুন করে তৈরি হচ্ছিল রঘুবীর। এক হাতে ব্যালেন্স করছে লেন্সটাকে। একটা ট্রাইপড থাকলে বেশ হত। তাহলে বাঁ হাতটাকে লেন্স ধরার জন্য ব্যস্ত রাখতে হত না। এফ স্টপ যথাস্থানে রেখে ডেপথ অফ ফিল্ড অ্যাডজাস্ট করে আরও একবার চোখ রাখল ভিউফাইন্ডারে।

- স্যার, চিয়া।

রঘুবীরের যাবতীয় একাগ্রতা চুরমার হয়ে গেল কারও গলার স্বরে। ম্যানুয়াল ফোকাস করা ছিল। শাটারে হাত পড়ে গেছে অসাবধানে।

যাহ্ ছবিটার বারোটা বেজে গেল। বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল রঘুবীর। রজনীগন্ধা হাসিমুখে ধোঁয়াওয়ালা চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পেছনে।

রঘুবীর রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারল না। রজনীগন্ধার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে শব্দ করে একটা চুমুক দিল। শরীরে আরাম হল। আর একটা লম্বা চুমুক দিতেই শীতভাব একটু কমল। প্রসন্ন গলায় বলল, থ্যাংকস।

রজনীগন্ধার চোখের তারায় আলো ঝিলমিল করে উঠল একটু। হেসে বলল, ওয়েলকাম।

এদিকে পূব দিগন্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর অন্য চুড়োগুলোতে সূর্যদেব ঢেলে দিচ্ছেন গলানো সোনা। লালচে রংটা আর নেই। এখন সোনারঙে ঢেকে গেছে সমস্ত পাহাড়চুড়ো। সোনালি রং মুছে গিয়ে সেখানে একটু একটু করে ফুটে উঠছে রুপোলি রং। অদৃশ্য এক জাদুকর পর্বতশীর্ষ মুড়ে দিচ্ছেন রুপোর পাত দিয়ে। রক্তিমবর্ণ থেকে কাঞ্চনবর্ণ, তারপর রজতশুভ্র।

রঘুবীর মনে মনে মহান্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাল একবার। ভাগ্যিস এমন একটা জাদুনগরীর ঠিকানা বাতলেছিল মহান্তি!

পাকা পেঁপে, টোস্ট, কলা আর ডিমসেদ্ধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট। সঙ্গে কফি। খিদে পেয়ে গিয়েছিল খুব। বুভুক্ষুর মতো পুরো খাবারটা সাবাড় করল রঘুবীর। আয়েশ করে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, গ্রেগরি কোথায়?

- ভোরবেলা বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি।

রঘুবীর কফির কাপটা রেখে একগাল হেসে বলল, ইউ আর টেলিং লাইজ।

রজনীগন্ধা থতমত খেয়ে বলল, মিথ্যে বলব কেন?

রঘুবীর বলল, কাল বিকেলে গ্রেগরি বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। আমি দেখেছি।

রজনীগন্ধা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বলল, চলুন, কাছাকাছি একটু হেঁটে আসা যাক।

লজ থেকে একটা রাস্তা খাড়া নেমে গেছে নিচে। সেই পথ ধরে নামছে দুজনে। ছোট ছোট খেতিতে চাষ হচ্ছে আলু, মুলো, লংকা, মটর, ফুলকপি আর বাঁধাকপি। সঙ্গে পালং আর রাইশাক। আশেপাশে দু'-চারটে ছোট ছোট বাড়ি চোখে পড়ল। সে সব বাড়িতে বাড়িতে বিন আর শিম ফলে আছে অফুরন্ত। রঘুবীর বলল, আমার এক বন্ধু এই জায়গায় ঘুরে গেছে আগে। ওর মুখে শুনেছি এদিকে নাকি পেস্টিসাইড ব্যবহার হয় না?

- দাওয়াইপানিতে সব শাকসবজিই অরগানিক। পেস্টিসাইডের ব্যাপার নেই কোথাও।

- দারুণ তো। আচ্ছা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

- একটা শিবমন্দির আছে সামনে। চলুন ঘুরে আসি সেখান থেকে।

রাস্তার দু'পাশে দেহাতি বাজার। আলু, টম্যাটো, শসা, স্কোয়াশ, লংকা, রাইশাক আর চাল-ডালের পশরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। মাঠে চলছে ফুটবল টুর্নামেন্ট। একটা মোমোর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল দুজনে।

দোকানে দাঁড়িয়ে মোমো খাচ্ছে অনেকে। রঘুবীরদের দিল এক প্লেট করে। বড্ড ঝাল। ঝালে শিসোতে শিসোতে রঘুবীর বলল, পাহাড়ের দোকানগুলোতে মোমো আর থুকপা সস্তা অথচ খুব টেস্টি।

রঘুবীর মোমো খাচ্ছিল উশ আশ শব্দ করতে করতে। রজনীগন্ধা একটু ইতস্ত করে বলল, আপনি যে ডাক্তার সেটা জানতাম না। কাল যদি মিসবিহেভ করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।

- আপনি আবার মিসবিহেভ করলেন কখন? রঘুবীর হাসল।

রজনীগন্ধা অপ্রতিভ স্বরে বলল, আমি ক্ষমা চাইছি। আসলে কী জানেন তো, আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে সবসময় টেনশনে থাকি। চোখের সামনে ও শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই।

- আপনার কথা শুনে আমি একটা জিনিস আঁচ করছি। কিন্তু সেটা নিশ্চিত করার জন্য গ্রেগরির সঙ্গে দেখা করাটা খুব জরুরি। ওর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার।

রজনীগন্ধা আকুল স্বরে বলল, গ্রেগরির কথা তো আপনাকে সব বলেছি। আপনি কী বুঝছেন সেটা একটু স্পষ্ট করে বলুন না। ওর কি ভাল হবার সম্ভাবনা আছে?

মোমো খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। রঘুবীর মোমোর প্লেট মাটিতে রাখতে রাখতে বলল, ইমপসিবল বলে কোনও কিছুতে আমি বিশ্বাস করি না। তবে গ্রেগরিকে আমি তো দেখিই নি এখনও। ওর সঙ্গে একটা সিটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিন।

- আচ্ছা দেখছি। আমি ওকে আপনার কথা বলব। দেখি কনভিন্স করতে পারি কিনা।

ফেরার সময় রজনীগন্ধা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে পড়েছে একটা কথা। আপনি যে মিসহ্যাপের কথা বলছিলেন সেটার কথা আমি কাগজে পড়েছিলাম। বছরখানেক আগে লেহ্-লাদাখে ঘুরতে গিয়ে

গাড়িসুদ্ধ বরফচাপা চাপা পড়েছিল ড্রাইভারসহ এক পরিবারের পাঁচজন। ড্রাইভার ছাড়াও চারজন মারা যায়। শুধু একজন সারভাইভ করেছিল।

- হ্যাঁ। সেই দুর্ভাগা আপাতত আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রঘুবীর মোমোর বিল মিটিয়ে দিতে দিতে ফিরে তাকাল রজনীগন্ধার দিকে।

- সেদিন কী হয়েছিল? অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল কেমন করে?

রঘুবীর বলল, প্রত্যেকটা মানুষের একটা ব্যক্তিগত কষ্টের জায়গা থাকে। আমারও আছে। সেদিনের দুর্ঘটনায় আমার পরিবারের প্রত্যেকে মারা যায়। শুধু আমি বেঁচে যাই। আমি পারতপক্ষে ওই অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছি।

- আপনার যদি বলতে আপত্তি থাকে তাহলে থাক।

রঘুবীর একটুক্ষণ কিছু ভাবল। তারপর বলল, সেদিন একটা জাইলো গাড়িতে সাড়ে সতেরো হাজার ফিট উঁচু নুব্রা উপত্যকার দিকে যাচ্ছিলাম আমরা। সিয়াচেনে আমাদের সৈন্যদের জন্য ওই পথ দিয়েই রসদ যায়। লাদাখের ট্যুরিস্টদের জন্যও ওটা দর্শনীয় জায়গা। লেহ শহর থেকে খারদুং লা-র দূরত্ব চল্লিশ কিমি। খারদুং লা পাস পেরনোর কিছু পরেই আচমকা বিরাট বরফের একটা চাঁই আমাদের গাড়ির ওপর এসে পড়ে।

- সর্বনাশ !

- ড্রাইভারের দু'পাশের জানলার ভেঙে গাড়ির ভিতরেও ঢুকে আসে বরফ। দরজা আটকে যায়, গাড়ির মাথাতেও কয়েক ফুট বরফ জমে যায় নিমেষে। এক পাশে খাড়াই পাহাড়, অন্যপাশে খাদ, মাঝখানে সরু রাস্তাটা গাড়ি সমেত চাপা পড়ে যায় বরফের তলায়।

রজনীগন্ধা রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর?

রঘুবীর বলল, আমাদের গাড়ির পেছনে ছিল একটা মোটরবাইক। সে উর্দ্ধশ্বাসে বাইকের মুখ ঘুরিয়ে কাছাকাছি যে পুলিশ আউটপোস্ট আছে সেখানে ঘটনা জানায়। সেনা, পুলিশ, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের অফিসারেরা ছুটে আসেন। বুলডোজার দিয়ে বরফ সরিয়ে সরিয়ে আমাদের গাড়ি খুঁজে পান বেশ কয়েক ঘন্টা পরে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। আমিও অজ্ঞান হয়ে ছিলাম, কিন্তু আমার ফুসফুসের জোর বেশি বলে হয়তো প্রাণটুকু ছিল।

রজনীগন্ধা বলল, একটা কথা তো বুঝতে পারলাম না। দুপুর থেকে বরফ সরানোর কাজ শুরু হওয়ার পরেও আপনাদের উদ্ধার করতে এত রাত হয়ে গেল কেন ?

রঘুবীর বুঝিয়ে বলল, পরে সেনা ছাউনিতে ওদের এক কর্নেলের মুখে শুনেছি, সেদিন উদ্ধারকারী দল যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তখন সেখানে পুরো এলাকা জুড়ে শুধু বরফ আর বরফ। তার মধ্যে আমাদের গাড়িটা ঠিক কোথায় রয়েছে সেটা ঠাহর করার উপায় ছিল না। ফলে নানা দিক থেকে বুলডোজার দিয়ে খেপে খেপে বরফ সরিয়ে গাড়ি খোঁজার চেষ্টা করছিল ওরা। তার মধ্যেই নতুন করে তুষারধস নামে।

রজনীগন্ধা জানতে চাইল, কিন্তু টিভিতে দেখি বরফ সরানোর বড় বড় দাঁতওয়ালা যন্ত্র থাকে। ওখানে সেরকম কিছু ছিল না ?

রঘুবীর বিষন্ন হাসল, ছিল। কিন্তু গাড়িটা কোথায় থাকতে পারে সেটা জানা ছিল না বলে ওরা ওরা ওই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেনি। গাড়ির দেওয়াল ফুঁড়ে আরোহীদের আঘাত লাগে! সেটা করতে গিয়ে উদ্ধারের কাজ বেশ কিছুটা দেরি হয়ে যায়। ইন ফ্যাক্ট সে রাতে রেসকিউ টিম একরকম হাল ছেড়েই দিয়েছিল। রাত ন'টা নাগাদ এক সেনা অফিসারের চোখে পড়ে চাপা পড়া গাড়িটির অংশ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বরফ সরানোর কাজ। রাত ন'টা নাগাদ বার করে আনা হয় আমাদের।

রজনীগন্ধা ফিসফিস করে বলল, ও মাই গড !

রঘুবীর ম্লান হেসে বলল, সেই অভিশপ্ত দিনের কথা পারতপক্ষে আমি বলতে চাই না। ওই টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো মাথায় একবার চলে এলে আর সহজে যেতে চায় না।

চুপ করে হাঁটছিল দু'জনে। বেশ খানিকটা পথ আসার পর রজনীগন্ধা আঙুল উঁচিয়ে বলল, এই যে এটাই শিবমন্দির।

বহু প্রাচীন মন্দির। জীর্ণ দশা। মন্দির চত্বর ঘিরে বুদ্ধের বাণী লেখা লাল, সাদা আর হলদে চৌকো বস্ত্রখন্ড উড়ছে পতপত করে। হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের এক আশ্চর্য সহাবস্থান। মন্দিরের পাশেই নেমে এসেছে পাহাড়ি ঝোরা। একটা কলাগাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে তেকোনা ডোঙা বানিয়ে খানিকটা জল ধরল রজনীগন্ধা। রঘুবীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নির্ভয়ে খেয়ে নিন। এই জল বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

রঘুবীর চুমুক দিল জলে। বেশ স্বাদু জল। সামনের দিকটা ইশারা করে রজনীগন্ধাকে বলল, সামনেই তো ডিপ ফরেস্ট। যতদূর জানি, এই জঙ্গল সিনচেন ফরেস্ট রেঞ্জের মধ্যে পড়ে। হরিণ আর বানর তো আছেই আর আছে কালো ভালুক। তবে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার চট করে দেখা যায় না। জঙ্গলের দিকে যাওয়া যাবে না একবার? কয়েকটা ছবি তুলব আর চলে আসব।

রজনীগন্ধা হেসে বলল, পারমিশন লাগে ভেতরে যেতে।

- তাহলে চলুন পারমিশন নিয়ে নিই।

- পারমিশন তো এখান থেকে হয় না। অনেকটা দূর যেতে হবে তাহলে। যতটা পথ আমরা এখানে এসেছি আবার ঠিক ততটা পথ ফিরে যেতে হবে।

- তাহলে পারমিশনের দরকার নেই। এমনিই একটা রাউন্ড ঘুরে আসি। ভয় নেই, কোর এরিয়াতে যাব না।

পাইন, বট, পিপুল, উতিশ, রানিচাপ, চাপ, শাউর বা লাপচেকাওলোর মতো বড় গাছের পাশাপাশি অসংখ্য ফার্ন আর মস। নানা প্রজাতির বাঁশের ঝাড় এদিকে ওদিকে। রয়েছে বহু প্রজাতির ঘাস। একটার পর একটা ছবি তুলে যাচ্ছে রঘুবীর। চরাই-উতরাই আর ঝোরা পেরিয়ে দু'জনে ঢুকে পড়েছে আরও গভীর অরণ্যে। বুনো গন্ধ আসছে নাকে। মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে কালোবরণ প্রমাণ সাইজের ঈগল।

ঠিক তখনই একটা অপার্থিব গলার আওয়াজ শুনে রঘুবীরের চোখ চলে গেল সামনের দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট পাথরের চাঁইতে বসা একজন। পরনে ময়লা একটা কালো কুটকুটে জ্যাকেট আর জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়া পুরনো জিনস। তামাটে গায়ের রং, গালে এলোমেলো আধপাকা দাড়ি, আদিম মানুষের মতো বড় বড় অযত্নের চুল, যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে উঠে আসা এক গুহামানব। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।

রজনীগন্ধা অস্ফুটে বলল, গ্রেগরি!

১২

স্মৃতি কেমন? মাঝে মাঝে পিচ গলে যায় না রাস্তায়? ঠিক সেরকম। কেউ জানে না, কোন স্মৃতি কখন গলবে। কোন চাকায় লেগে স্মৃতি থেকে দাগ উঠে আসবে। ছড়িয়ে যাবে খানিকটা পথ জুড়ে। সেটুকু পথ পার করে গেলে আবার স্মৃতিশূন্যতা।

কোনও এক খেয়ালি পাগল আপন খেয়ালে একটা অদ্ভুত রেখার টানে গ্রেগরির মাথার মধ্যে একটা নকশা এঁকে দিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে সেই রেখার ফাঁদে পড়ে বেচারা ঘুরে মরছিল। কখনও বৃত্তাকার, কখনও বক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল গ্রেগরি। ওর প্রতীক্ষায় বসে ছিল হা হা করা শূন্যতা। মনে হচ্ছিল এই শূন্যতার বুঝি সীমা নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শূন্যতা গ্রেগরিকে এখনও নিজের কাছে ডেকে নেয়নি।

মনে হচ্ছে যেন বহুকাল ঘুমিয়ে থাকার পর চোখ খুলেছে এইমাত্র। স্মৃতিভ্রষ্ট অভিশপ্ত মানুষের মতো অনন্তকাল ধরে একটা ঘন অন্ধকার টানেলের মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটছিল গ্রেগরি। ঘন কুয়াশায় মোড়া ধূসর দিন আর আঁধারকালো রাতগুলো যেন শেষ হয়েছে এবার। নিকষ কালো অন্ধকার সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে মেঘ ভাঙা রোদ। বোধহীন উচ্ছলতায় চোখে জল এসে গেছে গ্রেগরির। হাতের পিঠ দিয়ে অশ্রু মুছছে। মুছতে না মুছতেই আবার লোনা জল নামছে গাল বেয়ে। এই অশ্রু আনন্দের।

ঘরের সব বন্ধ দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন বাদে ঘরে আলো ঢুকছে আবার। চুল ছোট করে ছাঁটা, কামানো দাড়িগোঁফ, রগড়ে রগড়ে সাবান দিয়ে স্নান করেছে কয়েক মাস পর, গ্রেগরিকে দেখে চিনবার যো নেই আজ। বহুদিনের অনিয়মে আর অনাহারে শরীর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে রয়েছে। তবুও একটা আশ্চর্য উজ্জ্বলতা ঘিরে রেখেছে চোখ দুটোকে।

জ্বর থেকে সেরে উঠেছে, আজ থেকে কাজে আসতে শুরু করেছে পেমা চুকি। রজনীগন্ধার পাশে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে গ্রেগরিকে দেখছে এখন। তাজ্জব হয়ে দেখছে পাগলপারা মানুষটার মধ্যে পাগলামির কোনও লক্ষ্মণ আর নেই। কী আশ্চর্য, মৃতপ্রায় মানুষটার শরীরে মৃত্যুর কোনও ছায়া নেই আর। পেমা চুকি হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে একবার দেখছে গ্রেগরিকে, একবার জরিপ করছে রঘুবীরকে।

রজনীগন্ধাও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে গ্রেগরির দিকে। মাত্র তিন দিনে যে এমন ম্যাজিক ঘটতে পারে সেটা তার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। কী করে যে মৃতপ্রায় গ্রেগরিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে রঘুবীরের মুখোমুখি বসিয়েছিল সেটা রজনীগন্ধাই জানে একমাত্র। প্রথমদিন তো গ্রেগরি কোনও কথাই বলতে চায়নি রঘুবীরের সঙ্গে। কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য রঘুবীরের। গালিগালাজ উপেক্ষা করে, গ্রেগরির সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে বলে ওর অসহযোগের বর্মটাকে ভেঙে ফেলেছিল রঘুবীর। তারপর বাকি দু'দিন কাউন্সেলিং করে করে কী করে যে গ্রেগরির মধ্যে নতুন করে বাঁচার ইচ্ছেটা আবার চারিয়ে দিল এই স্বর্গ থেকে আসা দেবদূত সেটা রজনীগন্ধা জানে না!

রজনীগন্ধার চোখমুখে ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞতা। গলায় আপ্লুতি মিশিয়ে বলল, আপনি কি জাদু জানেন?

রঘুবীর হা হা করে হেসে উঠে বলল, জাদু হয়তো জানি না তবে মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি যখন তখন এই সাবজেক্ট খানিকটা জানি। গ্রেগরির সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল এখান থেকেও ওকে ফেরানো সম্ভব। গ্রেগরি প্রথম দিকে সেভাবে কো-অপারেট করছিল না। পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল। আমাকে খুলে বলল সব কথা। ও বলল, এতদিন ওর নিজেকে মনে হত একজন মৃত মানুষ। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও ক্লিনিকালি ডেড নয় বলে ওকে অহেতুক কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। ওর আসল জায়গা সংসারে নয়, গোরস্তানে।

রজনীগন্ধা বলল, সে কারণেই তো ও কবরখানায় গিয়ে পড়ে থাকত দিনের পর দিন। কিন্তু আপনি গ্রেগরিকে তিন দিন ধরে কী বোঝালেন?

রঘুবীর হাসল, আর পাঁচজন ডাক্তার হলে যেটা করবে সেটাই করেছি। আমি গ্রেগরিকে বুঝিয়েছি যে মৃত্যু একদিন না একদিন আসবেই। কিন্তু যতদিন সেটা না আসছে ততদিন ওকে মন থেকে 'মৃত' শব্দটাকে মুছে ফেলতে হবে। ইচ্ছে না করলেও নিয়ম করে মিউজিক সিস্টেমে গান চালিয়ে পছন্দ মতো গান শুনতে হবে। কাগজ পড়তে ইচ্ছে না করলেও আর কিছু না হোক নিদেনপক্ষে কাগজের হেডলাইন দেখতে হবে। এভাবেই মূল স্রোতে ফিরতে হবে ওকে।

গ্রেগরি একবার রজনীগন্ধা আর একবার রঘুবীরকে দেখছিল। এবার অস্ফুট স্বরে বলল, আমার আসলে কী হয়েছিল?

রঘুবীর বলল, আপনি এতদিন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। দিনের বেলা বাঁচা-মরার ফারাক বুঝতে পারতেন না।

গ্রেগরি বলল, সত্যিই তাই। সূর্য ডোবার পর দম দেওয়া পুতুলের মতো একা একা বেরিয়ে যেতাম বাইরে। হাঁটতে হাঁটতে গোরস্তানে গিয়ে শুয়ে থাকতাম বাবার কবরের পাশে। ওখানে শুয়ে আছে আমার আরও পূর্বপুরুষ। আমাকে দেখলেই ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠত। আমার সঙ্গে ওরা সবাই গল্প করত।

রঘুবীর হাসল, ওটা হ্যালুসিনেশন। ওসব আপনার কল্পনা। স্কিটজোফ্রেনিক রোগিদের এমন হয়। তবে এটা ঠিক ক্লাসিকাল স্কিটজোফ্রেনিয়া নয়। এই অসুখের দুটো নাম। কেউ বলেন ওয়াকিং কর্পস সিনড্রোম। কেউ বলেন কোটার্ডস সিনড্রোম। পৃথিবীর বিরল থেকে বিরলতম অসুখের মধ্যে একটা হল এই অসুখ।

রজনীগন্ধা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, তাহলে কেউ ওকে বাণ মারেনি ?

রঘুবীর মাথা নেড়ে বলল, আমরা ঘুমোলে বা আমাদের শরীরে অ্যানাস্থেশিয়া প্রয়োগ করলে আমাদের ব্রেনের কিছু অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যখন ঘুম ভাঙে তখন সব কিছুই আগের মতো সক্রিয় হয়ে আসে। কিন্তু গ্রেগরির বেলায় সেটা হচ্ছিল না। এ যেন অনেকটা স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াবার মতো ঘটনা। চব্বিশ ঘন্টা একটা ঘোরের মধ্যে থাকা।

গ্রেগরির গলায় জড়তা। বলল, আমাদের পরিবারে তো এমন কারও রোগ নেই। আমার তাহলে এমন কেন হল?

রঘুবীর বলল, এটা বংশগত অসুখ নয়। সত্যি কথা বলতে কী, এমন পেশেন্ট রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার। আপনার ব্রেনের মধ্যে শুকিয়ে গেছে অনেক কিছু। সেগুলোকে আবার নতুন করে সক্রিয় করে তুলতে হবে। তার জন্য সময় দিতে হবে।

গ্রেগরি আকুল গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আমি আবার ভাল হব তো?

রঘুবীর জোর দিয়ে বলল, ডেফিনিটলি। আমার কথামতো

যদি আপনি চলেন, ঠিকঠাক ওষুধ খান তাহলে জোর দিয়ে বলছি খুব তাড়াতাড়িই আপনি ভাল হয়ে যাবেন।

রজনীগন্ধা বলল, একজন ধর্মগুরু একবার দাওয়াইপানিতে এসেছিল। ওঁর মুখে শুনেছিলাম আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার পাশাপাশি অন্য একটা পৃথিবী আছে। আমি সে কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু গ্রেগরিকে দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভেবেছি যে এমন কি সত্যিই কিছু আছে? যে পৃথিবীতে হয়তো ওর বাবা-মা বেঁচে আছেন। এমন কি হতে পারে যে কিছু সময়ের জন্য সেই অচেনা একটা পৃথিবী গ্রেগরির কাছে এসে ধরা দিয়েছে?

রঘুবীর বলল, প্যারালাল ওয়ার্লড নিয়ে তত্ত্ব আছে। সেসব আমি বলতে পারব না। তবে একটা কথা বলতে পারি, মানুষের মস্তিস্ক এক অতি জটিল, অতি দুর্বোধ্য বস্তু। তার কান্ডকারখানা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। মস্তিস্কের ফ্রন্টাল লোবের কী কাজ তা এখনও কেউ ধরতে পারেনি। ফ্রন্টাল লোব কেটে পুরোপুরি বাদ দিলেও মানুষের কোনও সমস্যা হয় না। মস্তিস্কের একটি অংশের নাম থ্যালমাস। এ অংশ আমাদের চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ঠিক নিচেই হাইপোথ্যালামাসের অবস্থান।

রজনীগন্ধা বিস্মিত হয়ে বলল, সেটা আবার কী?

রঘুবীর ব্যাখ্যা করে বলল, হাইপোথ্যালামাস আমাদের আনন্দ বেদনার অনুভূতি পেতে সাহায্য করে। মস্তিস্কের এই অংশ অনুভূতি নিয়ন্ত্রক। এই অংশ উত্তেজিত হলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। সাইকোলোজিস্টরা বলেন, মস্তিস্কে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে প্রচন্ড খিদে পায়। সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় হাইপোথ্যালামাস উত্তেজিত হয়। তখন মানুষের বিচিত্র সব অনুভূতি হয়।

রজনীগন্ধা উৎসুক স্বরে বলল, কীরকম অনুভূতি হয়?

রঘুবীর বলল, আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার কৃত্রিমভাবে হাইপোথ্যালামাস উত্তেজিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, সাইকোলজিস্টরা বললেন, মানুষ তার ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেই মস্তিস্ক অসহায় হয়ে পড়বে। সে বুঝতে পারবে না এখন কী হচ্ছে। মস্তিস্কে প্রবল অস্থিরতা দেখা দেবে। এই অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্য সে তখন নানা রকম অদ্ভুত আচরণ করতে থাকবে।

রজনীগন্ধা চোখ বড় বড় করে বলল, কীরকম অদ্ভুত আচরণ করবে?

রঘুবীর বলল, সেটাই বলছি। মস্তিস্ক বাইরের জগত থেকে পুরোপুরি আলাদা হলে কী হয় সেটা দেখার জন্য ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্টরা এক অদ্ভুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সাউন্ডপ্রুফ একটা ঘর তৈরি করে সেই ঘরে চৌবাচ্চায় একজন মানুষকে রাখা হল। চৌবাচ্চার জলে কপার সালফেট মিশিয়ে তার ঘনত্ব করা হল মানুষের শরীরের ঘনত্বের সমান। জলের টেমপারেচার রাখা হল মানুষের দেহের তাপের মতো করে। মানুষটির নাক বন্ধ করে দেওয়া হল যাতে সে ঘ্রাণ নিতে না পারে। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার করে দেওয়া হল।

রজনীগন্ধা কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল, কেন এমন করা হল?

রঘুবীর বলল, আসলে এভাবে সবগুলো ইন্দ্রিয়র কার্যক্ষমতা বন্ধ করে দেওয়া হল। পরীক্ষা শুরু হল সাতজন ভলান্টিয়ারকে নিয়ে। তারা সবাই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রত্যেককে এক ঘন্টা করে আলদা ঘরে ঢোকানো হল। পরীক্ষার ফল হল সাংঘাতিক। সাতজনের মধ্যে দু'জন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে বেরোল। একজন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল। একজন বলল, সে নাকি আশ্চর্য এক জগতে চলে গিয়েছিল। সেই দুনিয়ায় কোনও মাধ্যাকর্ষণ নেই। সেখানে সকলে ইচ্ছে করলে ভেসে বেড়াতে পারে।

- সত্যিই ভাবা যায় না! রজনীগন্ধা চোখ বড় বড় করে বলল।

রঘুবীর বলল, মজার ব্যাপার যেটা, এদের মধ্যে একজন বলল, সে তার স্বর্গবাসী বাবা, মা, দাদু, দিদার দেখা পেয়েছে। বাকি তিনজন বলল, তারা যা দেখেছে এবং শুনেছে তা প্রকাশ করতে চাইছে না। শুধু এটুকু তারা বলবে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে।

গ্রেগরি হাঁ করে দু'জনের কথোপকথন শুনছিল। অস্ফুটে বলল, আমারও কি এমনটা হয়েছিল?

রঘুবীর নিজের চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমার ধারণা তাই। রিলে অনশনে যাবার জন্য ভিভিয়ানকে জোর করে রাজি করিয়েছিলেন আপনি। সেখানে যে পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হতে পারে, গুলি চলতে পারে, বাবার প্রাণও যেতে পারে সেটা আপনি একেবারেই আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু যখন চোখের সামনে বাবাকে পুলিশের গুলি খেয়ে মরতে দেখলেন তখন আপনি মনে মনে ভেঙে পড়লেন। তীব্র এক অপরাধবোধ আপনাকে কাবু করে ফেলল।

রজনীগন্ধা বলল, কিন্তু আমার শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যু তো আজকে ঘটেনি। সেই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর থেকে গ্রেগরির মধ্যে ধীরে ধীরে এই অসুখটা এসেছে।

রঘুবীর বলল, ডিপ্রেশন কখনও রাতারাতি হয় না। মনের অসুখের জন্য একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি দরকার। মস্তিস্কের স্বভাবটাই তাই। গ্রেগরি ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ওর বাবার মৃত্যু ওকে কুরে কুরে খেয়েছে। ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা করেছে ওপরে ওপরে কিন্তু প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত হয়েছে ওর মন। ভাল করে খাওয়া দাওয়া করেনি। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল প্রবল হতাশা বোধ। ফলে গ্রেগরির মস্তিস্ক প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে ওর মৃত বাবাকে উপস্থিত করেছিল ওর সামনে।

রজনীগন্ধা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, ও আবার আগের মতো হবে তো?

রঘুবীর মৃদু হেসে বলল, কেন হবে না? আলবাত হবে। শুধু আপনাকে গ্রেগরির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে।

১৩

- স্যার, চিয়া।

রজনীগন্ধা চা নিয়ে এসেছে ইয়া বড় কাপে। মাথায় মুন্ডি দেওয়া ঢাকনা। রংচংয়ে ড্রাগনের নকশা আঁকা কাপের গায়ে। সূর্যের আলো সরাসরি আসছে জানলা দিয়ে। বাঁ হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে ডান হাতের চেটো দিয়ে ঘুমচোখ রগড়ে চায়ের কাপটা নিতে নিতে রঘুবীর বলল, বাইরে এত সোরগোল কীসের?

রজনীগন্ধা আবার এসেছে এক প্লেট বিস্কুট নিয়ে। রঘুবীরের দিকে প্লেটটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, আজ থেকে পাহাড়ে পাঁচদিনের তিওহার শুরু হল। পাহাড়ের এটা সর্বজনীন উৎসব।

- তিওহার? সেটা আবার কী?

পাহাড়ে দেওয়ালির সময় পাঁচদিন ধরে উৎসব করা হয়। প্রথম দিন হয় কাক পুজো। একে বলে কাক তিওহার।

- কাক পুজো?

রজনীগন্ধা বলল, বাইরে এসেই দেখুন না।

রজনীগন্ধার পেছন পেছন ঘরের বাইরের একফালি বারান্দায় এল রঘুবীর। বাইরে সত্যিই নাটকের মতো দৃশ্য। স্থানীয় জনতা রাস্তার দুটো কুকুরকে স্নান করিয়েছে। তারপর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে, কপালে লাল রংয়ের টিকা পরিয়ে রুটি সবজি খাওয়াচ্ছে। কুকুরদুটো চেটেপুটে রুটি সবজি খাচ্ছে। তাদের ঘিরে হাততালি দিচ্ছে ছেলেপুলে। হাসাহাসি করছে বড়রাও।

গ্রেগরি একটা পুরনো কাঠের চেয়ারে বসে আছে বারান্দায়। গ্রেগরিকে একবার দেখল রঘুবীর। তারপর বলল, এমন উৎসবের কথা তো শুনিনি কখনও।

রজনীগন্ধা বলল, রামায়ণে আছে, চোদ্দ বছর বনবাস করে রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা ফিরে আসেন অযোধ্যায়। তাঁরা যে জঙ্গল থেকে ফিরে আসছেন সেটা অযোধ্যার মানুষ জানতে পেরেছিল কাক ও কুকুরদের মাধ্যমেই। তাই তাদের পুজো করা হয়।

গ্রেগরি মুখ ফেরাল এদিকে। সামান্য জড়ানো গলায় বলল, কাক হল মৃত্যুর দূত। তাই কাককে মারা যায় না। ওরা জীবনের জল খেয়ে নেয়। তাই কাককে পুজো করে সন্তুষ্ট রাখতে হয়।

রঘুবীর গ্রেগরিকে বলল, বাহ্ আপনার গলার স্বর তো প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে এখন! খুব ভাল প্রোগ্রেস হচ্ছে। তারপর চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, কী করা হয় এদিন?

গ্রেগরির কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। থমকে থমকে বলল, দেওয়ালির রাতে পাতার থালায় রকমারি খাবার বাড়ির সামনে কাকদের জন্য রাখা হয়। এই খাবার দেওয়ার আগে অবধি বাড়ির কেউ খাবার বা জল পর্যন্ত খায় না। কাকদের পর পুজো করা হয় কুকুরদের।

রজনীগন্ধা পাশ থেকে বলল, কুকুরদেরও অনেকে ধ্বংসের দেবতা, ভৈরব হিসেবে পুজো করে থাকেন। একে বলা হয় কুকুর তিওহার। তিওহারের তৃতীয়দিন হয় লক্ষ্মীপুজো। চতুর্থদিন গোবর্ধনপুজো। এই পুজোয় গোবর দিয়ে তৈরি ছোট পাহাড়ের আকৃতির ঢিবি তৈরি করা হয়।

- কেন?

- কৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড় তুলে নিয়ে পৃথিবীবাসী ও গরুদের বন্যা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। উৎসবের শেষদিন পাহাড়ে পালিত হয় ভাইটিকা। বোনেরা দাদা আর ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে উৎসব পালন করে।

গল্পে গল্পে বেলা বাড়ল কিছুটা। রঘুবীর একসময় বলল, একটু হেঁটে আসা যাক। গ্রেগরির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিও চলুন। একটু হাঁটাহাঁটি করলে দেখবেন ভাল লাগবে।

তিনজন পাশাপাশি হাঁটছে। রজনীগন্ধা একটা লাল ফুলকাটা ঘাঘরা পরেছে। ফুলহাতা জ্যাকেটের মতো শার্ট। গ্রেগরি জিনস পরেছে একটা। ওপরে ফুলহাতা নীল সোয়েটার।

চারদিক ঝকঝক করছে সোনা আলোতে। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কলাবন, কোথাও বাঁশঝাড়, কোথাও এলাচের ঝোপ। মৌমাছির ঘরও রয়েছে খুঁটির মাথায়। হাঁটতে হাঁটতে ধুপিবন এল। সরু সরু গুচ্ছ গুচ্ছ পাতা। শুকনো পাতায় আগুন দিলেই ধুপের গন্ধ। গ্রেগরি রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, এর আঠা থেকে দামি তেল হয়। কাঠ থেকে ঘরের মেঝে আর দেওয়াল।

খানিকটা হেঁটে আসার পর ধাপ ধাপ রং বেরং চাষের জমি। কোনওটা লাল সাদা ফুলে ভরা তো অন্যটা বেগুনি। রঘুবীর আঙুল উঁচিয়ে দেখাল, ওগুলো কী?

গ্রেগরি বলল, বেগুনি ফসলের নাম ফাফর। এর আটায় রুটি হয়।

মুখ তাকাতাকি করল রজনীগন্ধা আর রঘুবীর। ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে গ্রেগরি।

রজনীগন্ধা একবার গ্রেগরির দিকে তাকাল। তারপর বলল, একটা কথা বলি যদি কিছু না মনে করেন। যুগে যুগে পাহাড়ের আন্দোলন নানা রকম বাঁকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, আপনি কী চোখে দেখছেন এই আন্দোলন?

রঘুবীর স্মিতমুখে বলল, আমার কী মনে হয় জানেন, শুধু ভাষা বা জাতি দিয়ে একটা জায়গার পরিচিতি হয় না। সেখানকার স্থাপত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের যোগসূত্র দিয়ে হয়। অথচ জাতিভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যে জোর দেওয়ায় সেভাবে সেটা তৈরি হয়নি। আন্তর্জাতিক কোনও ফেস্টিভ্যাল কি এখানে আয়োজন করা হয়? উঁহু হয় না।

রজনীগন্ধা বলল, জাতিভিত্তিক স্বাতন্ত্রের মধ্যে দোষের কী। গোর্খা, লেপচাদের মতো জনজাতির মানুষরা এখানে আছেন বছরের পর বছর ধরে। সেটা কি অস্বীকার করেন?

রঘুবীর হাসল, একেবারেই না। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল দার্জিলিং কসমোপলিটন শহর। কোনও ট্রাইবাল অঞ্চল নয়। এই শহরের রেস্তোরা, বইয়ের দোকান, ফোটো স্টুডিও সব কিছুই ইতিহাস ছুঁয়ে আছে। অথচ সেই হেরিটেজ নিয়ে কেউ ভাবছে না। এখানকার ইন্টেলেকচুয়াল লাইফের কথা সমতলের মানুষের কাছে পৌঁছয় না। এখানকার সাংস্কৃতিক স্বর নিয়েও সমতল সেভাবে ওয়াকিবহাল নয়। কিন্তু তা কেন হবে? আসল সংহতি হল মননে। ভূগোল বইয়ে নয়।

রজনীগন্ধা হাসল, আপনার মতো আপনার চিন্তাভাবনাও অন্যরকম।

দুপুরে লাঞ্চের ভরপুর আয়োজন। সুন্দর করে সাজানো টেবিলে কাঁচের বাসনে রজনীগন্ধা সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ডুমো ডুমো ভাত, দই দেওয়া ডাল, আলুভাজা, লঙ্কা ও লেবুর চাটনি আর মাটনের একটা নতুন প্রিপারেশন। তেলের মধ্যে মাংসের কিউব ভাসছে। মশলাবিহীন পদ। অনেকটা ভাজা ভাজা আবার ঝোল ঝোলও। সুস্বাদু।

খাবার পর হাত ধুচ্ছিল রঘুবীর। রজনীগন্ধা কোত্থেকে একটা পেতলের পাত্র নিয়ে এসেছে। ভেতরে তেল মাখানো সিঁদুর। বুড়ো আঙুল দিয়ে রক্তবর্ণ টিকা পরিয়ে দিল রঘুবীরের কপালে।

রঘুবীর জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল। রজনীগন্ধা একগাল হেসে বলল, আজ থেকে আপনি আমার দাদা।

১৪

আজ পূর্ণিমা। সন্ধে ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলোয় ভেসে উঠেছে দাওয়াইপানি। এক অপার্থিব আলোয় ভরে উঠেছে

পাহাড়ি উপত্যকা। ফিনফিনে কুয়াশারা সরে গেছে, আকাশে আজ একটুও মেঘ নেই, উজ্জ্বল তারাগুলো হিরের কুচির মতো ঝকমক করছে। কৃষ্ণবর্ণ আকাশের সামিয়ানায় তারাগুলো আজ যেন নেমে এসেছে হাতের একেবারে কাছে। ইচ্ছে করলেই যেন আঙুল বোলানো যাবে। একটা দেওদার গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে রঘুবীর। অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ঘরের সামনে এক চিলতে উঠোনে। সেখানে সুন্দর করে কাঠকুটো সাজিয়েছে রজনীগন্ধা। প্রস্তুতি চলছে, একটু পরে আগুন জ্বলবে এখানে। রজনীগন্ধার ইচ্ছেতে আজ জমিয়ে ক্যাম্প ফায়ার হবে। আজকের এই পিকনিকের আয়োজন করেছে পেমা চুকি আর রজনীগন্ধা। দুজনে মিলে বাজার করে এনেছে সকাল সকাল। মাটনের একটা তিব্বতি প্রিপারেশন রান্না হবে, সেজন্য মাংস ম্যারিনেট করে রেখেছে সকাল থেকে। গ্রেগরিও যথাসাধ্য সাহায্য করেছে দু'জনকে।

একটু পরে আগুন জ্বালানো হল। কাঠের লালচে আগুনের ফুলকি সোল্লাসে ছুঁতে চাইল আকাশের তারাগুলোকে। রঘুবীরের হাতে রামের গ্লাস, সিগারেট ধরিয়েছে একটা। ওদিকটায় বসে রয়েছে রজনীগন্ধা আর গ্রেগরি। চাঁদের দুধসাদা আলোর সঙ্গে আগুনের লালচে রং মিশে এসে পড়ছে রঘুবীরের মুখে।

রজনীগন্ধা মৃদু স্বরে বলল, কাল চলে যাবেন। আপনার কথা ভেবে মন খারাপ লাগছে।

রঘুবীর হাসল একটু। নরম গলায় বলল, অনেকদিন থাকা হল এই আশ্চর্য পাহাড়ি গ্রামে। কাল ফিরে যাব। মনটা একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

রঘুবীর জানে এ ছিল তার এক শূন্যতার সফর। যাবার আগেও সেই শূন্যতা, সেই স্পেস এসে তার কানে কানে যেন বলে গেল, তুমি ক্রমশ ভেতরে বাড়ো। আমি সতত বাইরে বাড়ছি। এবার গ্রেগরি আর রজনীগন্ধা মুখ ফিরিয়ে এগোবে তাদের নিজস্ব বাড়ির দিকে। রঘুবীরের যাত্রা শুরু হবে ছয় ঋতু আর বারো মাসের নিঃশব্দ তর্জনী পার করে তার না-বাড়ির দিকে। রঘুবীর জানে, এই যাত্রাপথের শুরু আছে। শেষ নেই। নিরবধিকালের চিহ্নীকরণ কি আর করা যায় কখনও!

রঘুবীরের ঘোর কাটল রজনীগন্ধার স্বরে। রজনীগন্ধা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, তাহলে ও ভাল হয়ে যাবে তো?

রঘুবীর সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা আগুনে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলল, ওষুধগুলো নিয়মিত খেলেই দেখবেন গ্রেগরি নরমাল হয়ে গেছে। গ্রেগরি খুব ভাগ্যবান যে ও আপনার মতো একজন স্ত্রী পেয়েছে।

রজনীগন্ধা ডুবে যাওয়া গলায় বলল, আমি ওকে খুব ভালবাসি। আমার জীবন দিয়ে দিতে পারি ওর জন্য।

রঘুবীর প্রসন্ন স্বরে বলল, আমি জানি। একটা গাছ ঝড়ের সময় অন্য গাছের শরীরে যেভাবে লুটিয়ে পড়ে, আপনারাও তো সেভাবে লুটিয়ে পড়েন একে অন্যের সান্নিধ্যে। আনন্দে, কিংবা বিষাদে। প্রিয় মানুষের মুখ যে শুশ্রূষা দিতে পারে সেটা আর কিছু পারে না।

একটুক্ষণ চুপচাপ। রঘুবীর অন্যমনস্ক স্বরে বলল, আমরা মৃত্যুকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখি। আমার মনে হয় মৃত্যু অস্তিত্বের কোনও অবসান নয়। মৃত্যু হল জীবনেরই এক চলমান স্তর। মানুষ তার মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে নিজেরই অন্তর্গত বলে জানতে পারে একদিন। যে কোনও মানুষের মৃত্যু যেন নিজেরই এক টুকরো মৃত্যু। জীবন যে অন্তিমের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে তার প্রস্তুতি হতে থাকে আশেপাশের মানুষদের মৃত্যুধারার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে করে। চেতনাশীল মানুষ এই মৃত্যুভয়কে প্রতিরোধ করেন অন্য ভাবে। তাঁরা মগ্ন হয়ে যান শিল্প সৃষ্টিতে। আমি যে খুব সাহসী তা নই। আমার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু আমাকে ভীত করে তুলেছিল। মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ফেরাব বলেই আমি ডুব দিয়েছি নিজের কাজে।

রজনীগন্ধা গাঢ় স্বরে বলল, বিশ্বাস করুন, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছে আমার।

রঘুবীর ম্লান হাসল, এক একজন মানুষের দুঃখকে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া এক এক রকম। পুলিশের গুলি খেয়ে ভিভিয়ানের অসহায় মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি নরম মনের গ্রেগরি। সে কারণে ওর মধ্যে দেখা দিয়েছিল ওয়াকিং কর্পস সিনড্রোমের মতো জটিল মানসিক রোগ। সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

এক পলক গ্রেগরির দিকে তাকাল রঘুবীর। গ্রেগরি বড় বড় চোখ করে দেখছে রঘুবীরকে। রঘুবীর নিজের বুকে টোকা মেরে বলল, এদিকে আমার ভাগ্যটা দেখুন। গ্রেগরির যেমন বাবা মারা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমার দুই প্রিয়জন, আমার স্ত্রী আর পুত্র চোখ বুঁজেছিল আমার চোখের সামনে। আমার মতো দশা হলে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ত বেশির ভাগ লোক। কিন্তু আমি সেই ফেজ কাটিয়ে উঠেছি। আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে জীবনের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা।

রজনীগন্ধা অপলক চোখে দেখছিল রঘুবীরকে। সম্পূর্ণ অন্য একটা বৃত্ত থেকে দেবদূতের মতো একটা মানুষ এসেছিল তার নিজস্ব বৃত্তে। আমূল বদলে দিয়ে গেল তার জীবনের। গ্রেগরি যে ভাল হবে কোনওদিন সেই আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। এখন আশা জাগছে। নতুন জীবন নতুন প্রত্যাশা নিয়ে কড়া নাড়ছে তার দরজায়।

রজনীগন্ধা ভেতরের কান্নাটাকে গিলে নিতে নিতে বলল, ন'টা বেজে গেছে। ডিনার রেডি। আপনি ইচ্ছে করলে খেয়ে নিতে পারেন।

রঘুবীর গ্লাসে তলানিতে পড়ে থাকা তরল গলায় ঢালল একবারে। ঘড়ি দেখল আলগোছে। উঠল নিজের জায়গা ছেড়ে। টলছে একটু একটু। নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

রজনীগন্ধা পাশে গিয়ে দাঁড়াল রঘুবীরের। বাঁহাতের কনুইয়ের কাছটা ধরল, যাতে রঘুবীর পড়ে না যায়।

রঘুবীর দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে হাসল একটু। দেবতার মতো পবিত্র হাসি। সে হাসিতে কামগন্ধের লেশ নেই একটুও।

রজনীগন্ধার বুকের মধ্যে এখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। রঘুবীরকে হাসিটা ফেরত দিতে গিয়ে দিতে পারল না রজনীগন্ধা। কেঁদে ফেলল শব্দ করে। বার বার মনে হচ্ছে, ইস, হৃদয়ের গভীর হৃদয় থেকে তুলে এনে এই ঋষিতুল্য মানুষটাকে একটা গোলাপ, না গোলাপ নয়, একমুঠো রজনীগন্ধা যদি উপহার দিতে পারত সে!

- (এই কাহিনির সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তবের কোনও ঘটনার সঙ্গে এই উপন্যাসের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই)

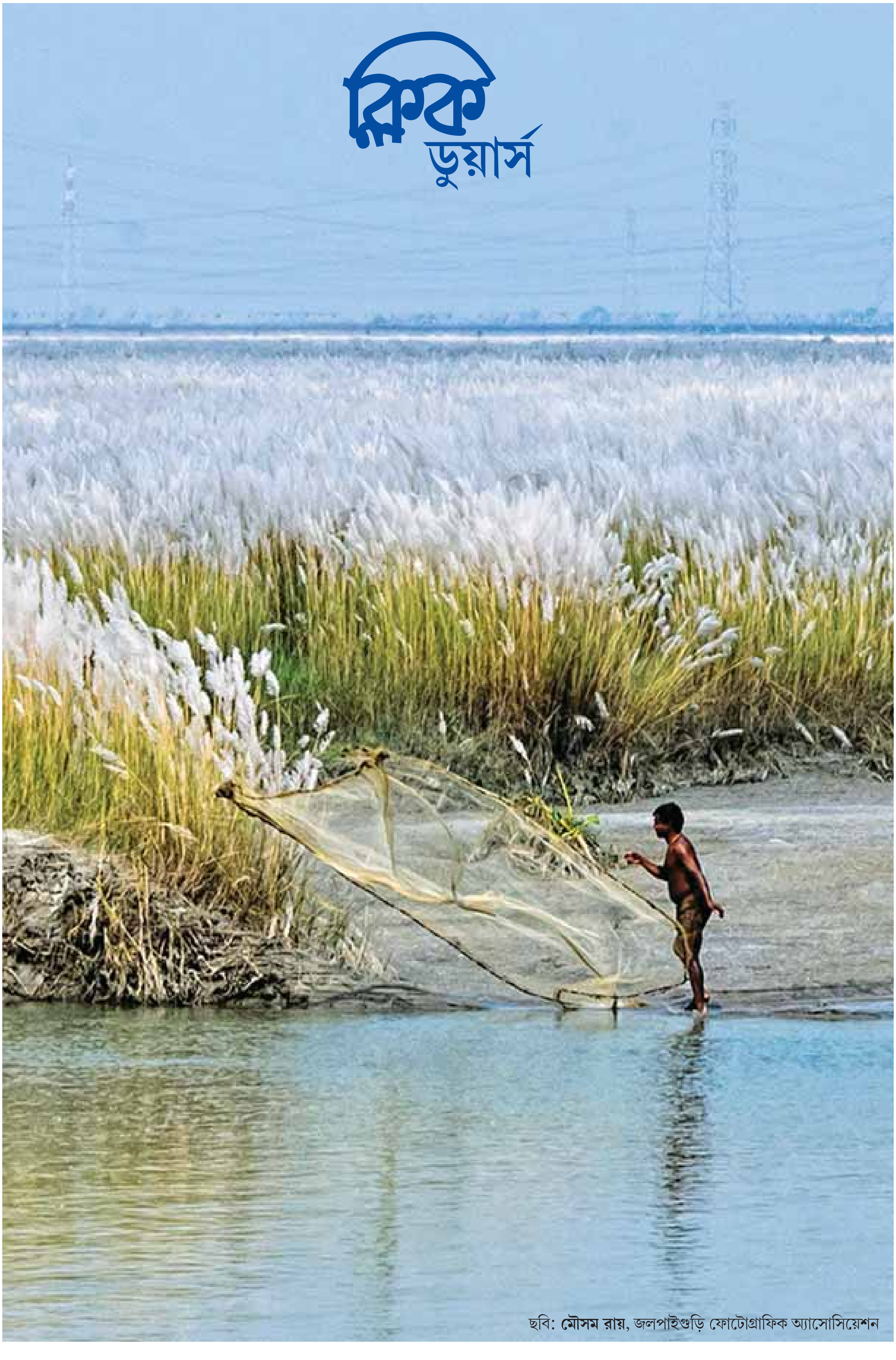

ছবি: **মৌসম রায়**, জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন

এখন ডুয়ার্স আয়োজিত

মোবাইল ফোন ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ছবি

ছবি: অভিষেক ব্যানার্জি

ছবি: সীমা দেবনাথ

ছবি: শম্পা সরকার

ছবি: পিঙ্কু সরকার

ছবি: লিপিকা কর্মকার

ছবি: অন্তর্লীনা মুখার্জি

ছবি: তাপস দাস

ছবি: চিন্ময় ঘোষ

ছবি: সাগর চ্যাটার্জি

ছবি: জয়ব্রত রায়

ছবি: পারমিতা ব্রহ্মচারী

ছবি: বিপু পোদ্দার

ছবি: অনির্বাণ রায়

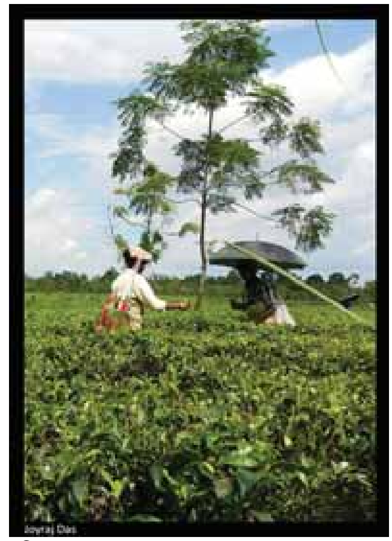

ছবি: জয়রাজ দাস

ছবি: তীর্থঙ্কর বসু মজুমদার

ছবি: হামিম হোসেন মন্ডল

ছবি: গোবিন্দ বণিক

ছবি: দুর্বাদল মজুমদার

ছবি: সুপ্রিয় মিত্র

ছবি: শুভশ্রী কুন্ডু

ছবি: প্রতীমা পাল

ছবি: পিনাকী সরকার

ছবি: সুব্রত সাহা

ছবি: শক্তি পাল

ছবি: রাজীব সেন

ছবি: মনোরঞ্জন সরকার

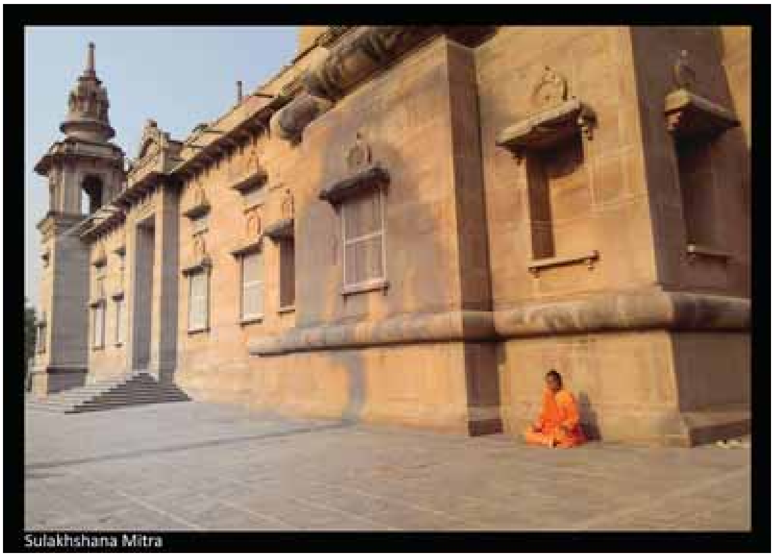

ছবি: সুলক্ষণা মিত্র

ছবি: সৌমেন চ্যাটার্জি

ছবি: অভীরূপ গাঙ্গুলি

ছবি: কৌশিক অধিকারী

ছবি: অভিষেক দাস

ছবি: হরসিৎ মন্ডল

ছবি: প্রীতম ঘোষ

ছবি: প্রীতম সামন্ত

ছবি: রাজদীপ

ছবি: ইমন কল্যাণ সরকার

ছবি: জিকেল দে

ছবি: জয়ন্ত কুমার রায়

ছবি: মৃগাঙ্ক দাস

ছবি: জেসু রায় চৌধুরী

ছবি: মৃণ্ময় বিশ্বাস

ছবি: রুমা সাহা

ছবি: সায়নদীপ কুন্ডু

ছবি: শান্তনু মুখার্জি

ছবি: সুদীপ্ত সরকার

ছবি: সায়ন রায়

ছবি: শুভংকর রায়

ছবি: সুমন দত্ত

ছবি: বিশ্বজিৎ সিংহ

ছবি: উদয় সাহা

ছবি: ভাস্কর কুমার দাস

ছবি: ডা. সায়ন পাল

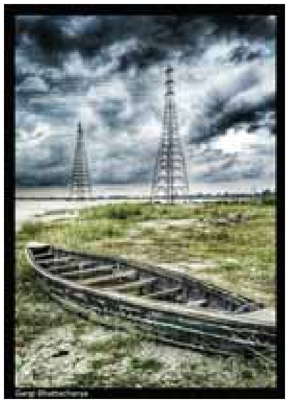
ছবি: গার্গী ভট্টাচার্য

ছবি: তীর্থরাজ রায়

ছবি: মহম্মদ সফিউল্লা

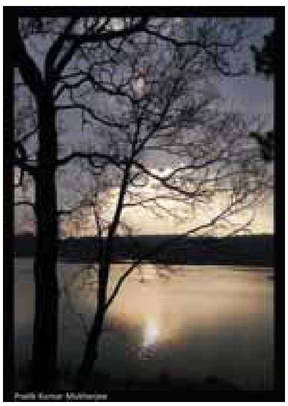
ছবি: প্রতীক কুমার মুখার্জি

ছবি: শাঁওলি দে

ছবি: অর্ঘ্য চক্রবর্তী

ছবি: শুক্লা রায়

ছবি: গৌর সাহা

ছবি: কুহেলি সেন

ছবি: মানসী দেব সরকার

ছবি: রেহেমান সেলিম

ছবি: সন্দীপ মিত্র

ছবি: মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

ছবি: সুচিস্মিতা কানুনগো

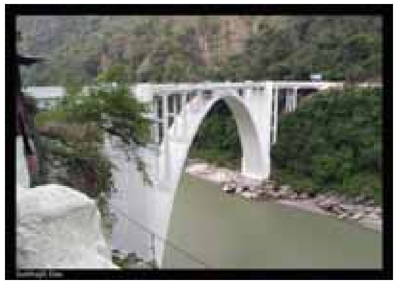
ছবি: শুভজিৎ দাস

ছবি: সঞ্জিৎ রায়

ছবি: অরিত্র সরকার

ছবি: তানিয়া রায়

ছবি: অভ্রনীলয় বসু

ছবি: টিপলু বসু

ছবি: রাখি পুরকায়স্থ

ছবি: দেবাশিস সরকার

ছবি: পৌষালী ঘোষ মুখার্জি

ছবি: উমেশ ঘোষ

ছবি: নীলাঞ্জন দাস

ছবি: আজহারউল ইসলাম মন্ডল

ছবি: রাজীব ঘোষ

ছবি: প্রতাপ সরকার

ছবি: অঙ্গীরা ভট্টাচার্য

ছবি: শালিনী মিত্র

ছবি: স্বপ্ননীল রুদ্র

ছবি: পিয়ালী দাস

ছবি: পৌরবী সেনগুপ্ত

ছবি: পারিজাত মজুমদার

ছবি: প্রশান্ত কুমার রায়

ছবি: শুভ্রদীপ বসাক

ছবি:মণীষা লাকড়া

ছবি: সৌরভ কর্মকার

ছবি: রাহুল ইসলাম

ছবি: অম্লানজ্যোতি ঘোষ

কলম সিং-এর
ডুগালবাবা উপাখ্যান

কলিকাগ্রাম কলকে সমিতির মহালয়ার পিকনিকের মিটিং শেষ হইবার পর কলম সিং এক ছিলিম মহাতামাক সেবন করিয়া শিবনেত্র হইয়া আছেন। সমিতির সদস্য দারোগা বসুনিয়া পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা উৎকৃষ্ট মহাতামাকের বস্তা হইতে গোপনে খানিকটা ছিঁড়িয়া আনিয়াছিলেন। তাহা কলম সিংকে ভেট দেওয়ার কারণে মিটিং-এর গোড়া হইতেই তিনি প্রফুল্ল ছিলেন। উক্ত তামাকসেবনের পর তাঁহাকে প্রফুল্লতর দেখাইতেছিল। সেবনের পর জিলাপি চিবাইয়া তাহা প্রফুল্লতমতে উপনীত হওয়ায় তিনি চক্ষু উন্মোচন করিয়া বলিলেন, 'মহালয়া বিষয়ে একখানা ঘটনা স্মরণে আসিল। ভাস্কো-দা-গামার নাম শুনিয়াছ?'

গল্পের আশায় সদস্যরা সকলে জোর গলায় 'হ্যাঁ' বলিল। কলম সিং সুখী মুখ করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের গল্প বলিয়া সুখ আছে। মহাতামাক সেবন করিলেও তোমাদের স্মৃতি অটুট থাকে।'

'ভাস্কোবাবুর সঙ্গেও আপনার ফ্যামিলির সম্পর্ক ছিল বলছেন?' ঠোঁটকাটা বাচ্চা সাংবাদিক চম্পক সেন কহিল। কলম সিং অবশ্য অর্বাচীনের কটাক্ষ সহাস্যে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, 'ভাস্কোর সঙ্গে কিছু ঘটে নাই। তবে তাহার সঙ্গে আসা একজন সাহেবের সঙ্গে ঘটিয়াছিল। তাহার নাম ম্যাকডুয়াল। তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়াছিলেন ইলিশ মৎস্য খাইবার অভিপ্রায়ে। তা, মৎস্য কীভাবে বধ করা হয়, তাহা হাতেকলমে দেখিবার জন্য নৌকা লইয়া এক দিবসে মোহানা হইতে পদ্মায় ঢুকিতেছিলেন। তখন খুব ঝড় আসে। নৌকা উলটাইয়া ম্যাকডুয়াল সাহেব ভাসিয়া যান। তিন দিন পর অজ্ঞান অবস্থায় গাজলডোবার ঘাটে আসিয়া ঠেকেন।'

'চট্টগ্রামের মোহানা থেকে গাজলডোবা?' স্কুল মাস্টার অমূল্যবাবু কাশিয়া ফেলিলেন— 'ঠিক বলছেন তো?'

'অসম্ভব ভাবিবার কোনও কারণ নাই।' এক ঢোক জল পান করিয়া বলিলেন কলম সিং, 'সেকালে তিস্তা পদ্মায় মিশিত। আমার ভাই ফলটেন সিং একবার জলঢাকায় ডুবিয়া যায়। এক সপ্তাহ পর একখানি হিমবাহের নিকট ভাসিয়া ওঠে। ফিরিয়া আসিয়া সে জলঢাকার উৎস লইয়া একখানি পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছিল। পরে কোনও গবেষককে বেচিয়া দেয়।'

কলম সিং দম লইবার জন্য থামিলেন। সভায় পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। কেহ আর গল্পের প্রবাহে বাধাপ্রদানের চেষ্টা করিল না। চারিদিকে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। শরৎ আসিলেও বর্ষা যায় নাই। সমিতির সভার পক্ষে আদর্শ

পরিবেশ হইয়া আছে। দারোগার মহাতামাকে উচ্চশ্রেণির মৌতাত হইয়াছিল। সবাই চুপ করিয়া গল্প শুনিতে লাগিল।

'গাজলডোবার ঘাটে ম্যাকডুয়াল সাহেবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন আমার পূর্বপুরুষ ভুস্কু সিং। তিনি তখন সেখানকার অরণ্যে ব্রহ্মযোগ প্র্যাকটিস করিতেছিলেন। ম্যাকডুগাল মরিয়াই গিয়াছিল। ভুস্কু সিং তাহাকে চিৎ করিয়া নাভিমণ্ডলে জলধি মুদ্রা প্রয়োগ করিলেন। সাহেব 'হোয়াট হ্যাপেনস' বলিয়া উঠিয়া বসিল। পরে যখন জানিল যে, ভুস্কু সিং-এর হাতে তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে, তখন তাহার পা জড়াইয়া বলিল, 'যিশুর দিব্যি! মেক মি ব্রহ্মযোগী।'

কেউ কিছু বলিতে চাইয়াছিল, কিন্তু বাকিরা চিমটি কাটিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

'ভুস্কু সিং শিখাইতে রাজি হইলেন। তাঁহারও একজন শাগরেদের দরকার ছিল। ম্যাকডুগাল বহু বছর ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ব্রহ্মযোগ শিখিল। শীর্ষাসনে খাইতে শিখিল। পদ্মাসনে পটি করিতে শিখিল। ধনুরাসনে আকাশ দেখিতে শিখিল। শেষে দম বন্ধ করিয়া সাত দিন তিস্তার জলে ডুবিয়া থাকিবার পর ভুস্কু সিং প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ব্রহ্মযোগী বলিয়া মানিয়া লইলেন। তাহার নাম হইল ডুগালবাবা। অবশ্য ততদিন অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সাহেব যে দিন ডুগালবাবা হইলেন, সেদিন সিরাজ-উদ্‌দৌলা কলকাতা অ্যাটাক করিয়াছিল।'

সভা স্তব্ধ। চারপাশের গাছগাছালি জঙ্গল হইতে কেবল পাখির ডাক ভাসিয়া আসিতেছিল।

'যোগী হইবার পর ভুস্কু সিং-এর ইচ্ছায় ডুগালবাবা চালসায় আসিয়া বসবাস শুরু করিলেন।' খানিকটা জল গলায় ঢালিয়া মুখ মুছিয়া আবার শুরু করিলেন কলম সিং, 'ক্রমে লোকের মুখে মুখে ডুগালবাবা নামখানি বদলাইয়া হইল দয়ালবাবা। তবে সাহেব বলিয়া তিনি অতিশয় ফরসা ছিলেন। গৌরবর্ণের কারণে অনেক তাঁহাকে গোরাবাবাও কহিত। অবশেষে তাঁহার নাম হইয়া গেল দয়ালগোরা। ইহার পর ইংরাজরা রেললাইন পাতিবার কারণে জমি জরিপ শুরু করিলে দয়ালগোরার খ্যাতি বাড়িয়া গেল। কারণ বাবা ইংরাজি জানিতেন। তাঁহার মুখে মাতৃভাষায় ব্রহ্ম থিয়োরি শুনিয়া সাহেবরা স্পেলবাউন্ড হইয়া গেল। উহারা ভাবিয়াছিল যে রেললাইন স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু বাবা তাহাদের কর্মযোগ মানিয়া ধ্যান করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহা মানিয়া তাহারা মনের জোর ফিরিয়া পাইয়া রেললাইন বসাইবার সংকল্প করে। ডুয়ার্সে প্রথম চা-বাগান গাজলডোবায় কেন হইয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদ তোমাদের জানা নাই। উক্ত স্থানে বাগান গড়িবার পরমর্শ বাবাই দিয়াছিলেন।'

'দয়ালগোরা কি এখনও বেঁচে?' থাকিতে না পারিয়া বসুনিয়া দারোগা জিজ্ঞাসা করে বসিলেন। কলম সিং হাসিয়া বলিলেন, 'বাঁচিয়া থাকিলে কি আর এই গল্প হইত? গল্পটা তো তাঁহার মরিয়া যাওয়া লইয়া। ব্রিটিশরাই ভুল করিয়া তাঁহাকে একদিন গুলি করিয়া দিল।'

'সে কী!' সদস্যরা সকলেই কমবেশি আশ্চর্য হইলেন— 'মরিল কী করিয়া? ব্রহ্মযোগী আবার মরে নাকি?'

'তাহারা মরা বাঁচাইতে জানে। নিজেরা মরিয়া গেল কীরূপে বাঁচাইবে? তাহার জন্য অপর ব্রহ্মযোগী চাই। অপঘাতে না মরিলে ব্রহ্মযোগীরা শত শত বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তাই গুলি খাইয়া বাবা মরিয়া গেলেন। সংবাদ লইয়া লোক ছুটিল গাজলডোবায়, ভুস্কু সিং-এর সন্ধানে। ভুস্কু সব শুনিয়া যখন আসিলেন, তখন সাহেবরা ভুল করিয়া বাবাকে পোড়াইয়া দিয়াছে। শ্মশানে খোঁজ করিয়া কিছু দগ্ধ হাড়গোড় পাওয়া গেল। ভুস্কু সিং তাহার উপর অমৃত মুদ্রা প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু গোটা বডি না পাইবার কারণে বাবা আর ফিরিলেন না। উহার পরিবর্তে একখানি তক্ষক জন্মাইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে জঙ্গলে চলিয়া গেল। ভুস্কু বলিলেন, ডুগাল তক্ষক হইল। আজ হইতে তক্ষকের দাম বাড়িল। তোমার নিশ্চয়ই জানো যে, ডুয়ার্সে তক্ষক কেমন চড়া দামে বিক্রয় হয়?'

'তা জানি।' পেনশনারস' অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি পুলক দাস কহিলেন, 'তবে কারণটা জানতাম না। এখন জানলাম।'

'কিন্তু গোরাবাবা মরল কেন?' দারোগা বসুনিয়া খেই ধরাইয়া দিলেন, 'মরলই বা কোথায়?'

'জঙ্গলে।' কলম সিং হালকা একটি টান সারিয়া ধূম্র উদ্‌গারের পর জানাইলেন, 'তিনি বৃক্ষদের সহিত কথা বলিবার নিমিত্ত জঙ্গলে নিরিবিলিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। দুই সাহেব তখন হরিণ মারিতে আসিয়াছিল। বিশেষ আসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হরিণের মতো দেখাইতেছিল। সাহেবরা ভাল করিয়া না দেখিয়াই একবারে গুলি চালাইয়া দেয়।'

'আহা!' পুলক দাস যেন খুব দুঃখ পাইলেন— 'এত বড় একখানা ট্যালেন্ট মরে গেল!'

'লোকে তোমার মতোই দুঃখ পাইয়াছিল সে দিন।' কলম সিং বলিয়া চলিলেন, 'তাহারা বিদ্রোহ করিবে ভাবিয়াছিল। ভুস্কু সিং না আটকাইলে সে দিনই বিদ্রোহ সফল হইত এবং ইংরাজরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু ভুস্কু সিং বলিলেন, ইংরাজরা সদ্য আসিয়াছে। তাই উহাদের ভাগাইয়া দেওয়া অর্থহীন। তাহারা দয়ালগোড়ার নাম ইতিহাসে রাখিবার জন্য তাহার নামে জঙ্গলের নাম করণ করিয়া দিবে। তখন সেই জঙ্গলে রাশি রাশি মানুষ বেড়াইতে আসিবে। দয়ালগোড়ার জীবন ধন্য হইবে। ভুল বোঝার কারণে গুলি চলিয়াছিল। ইহার জন্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের এখনই প্রয়োজন নাই। রেললাইন পাতার কাজ শেষ হইবার পূর্বেই ব্রিটিশ ভারত ছাড়িলে বাকি লাইন পাতিবে কে?'

'ঠিক ঠিক।' বাচ্চা সাংবাদিক সায় দিল।

কলম সিং চুপ করিলেন।

'তা গল্প কি শেষ?' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দারোগা বসুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জঙ্গলের নামকরণের পর আর কিছু ঘটে নি?'

'সেই জঙ্গলের নাম জানো?' কলম সিং পালটা জিজ্ঞাসা ছুড়িলেন। দারোগা থতমত খাইয়া বলিল, 'তা জানি না। বিট অফিসার সোমবাবু বলতে পারবেন।'

সোমবাবু ভুরু কুঁচকাইয়া বিশদ ভাবিয়া জানাইলেন, 'স্মরণে আসছে না। শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। অবশ্য আমার বেশি দিন চাকরি হয়নি।'

'ইহার জন্যই কবি বলিয়াছেন যে আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঠোঙা হাতড়াইয়া একখানি জিলিপি বাহির করিয়া কামড়াইলেন কলম সিং— 'ব্রিটিশরা শেষের দিকে বাবাকে গোরাবাবা বলিয়াই ডাকিত। তাই জঙ্গলের নাম তাঁহারা দিয়াছিলেন গোরামারা ফরেস্ট। তোমরা না জানিয়া বলো গোরুমারা।'

'বলেন কী?' বিট অফিসার চমকাইয়া উঠিলেন— 'গোরা হইতে গোরু হইল কীভাবে? আমি যে শুনিয়াছিলাম, বৈকুণ্ঠপুরের রাজা বাঘ ভেবে গোরু মেরে দিয়েছিলেন বলে এই নামটা হয়েছে?'

'সে তোমরা পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য জানিয়াছ। আমি যাহা বলিলাম, তাহা জ্ঞানের বিষয়। আর জানিয়া রাখো যে, গোরাবাবা গুলি খাইয়াছিল মহালয়ার ভোরে। এই নিমিত্ত ডুয়ার্সে মহালয়াতে রাতভর বাজি পোড়ানো হয়। তবে এইসব কথা চাপিয়া রাখি, কারণ সত্য বলিলে ডুয়ার্সের ইতিহাস আবার নতুন করিয়া লিখিতে হইবে। আমাকেই তখন দায়িত্ব লইতে হইবে। ইতিহাস লিখিতে বসিলে সমিতি জমিবে কী প্রকারে? তোমরা কি চাহ যে, সমিতি ছাড়িয়া আমি গৃহে বসিয়া ইতিহাস রচনা করি?'

'অসম্ভব!'

সমিতির সদস্যরা সমস্বরে চিৎকার করিয়া মত প্রকাশ করিল। অমনি বৃষ্টি শুরু হইল ঝমঝম করিয়া।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

বাস স্পট

সেই দু'দশক আগে বাস স্ট্যান্ডে জায়গা বাড়াবার জন্য ব্যবসায়ীরা জমি কিনে দিয়েছিলেন কাস্টমসকে — অথচ দ্যাকো! স্ট্যান্ড মোটেও বাড়ল নাকো! উলটে দোকান মালিকরা প্রতিরাতে এক ইঞ্চি করে দখল করে দিনে দিনে স্ট্যান্ডটাকে বাড়ির উঠোনের সাইজে এনে ফেলছে। আগে একখানা আস্ত ট্রাক ঘুমাতে ঘুমাতে স্ট্যান্ডে পাশ ফিরত। এখন দ্যাকো, একটা ছোট বাসের ঘুরতে-ফিরতে কেমন দম বেরিয়ে যাওয়ার জো! এমন চললে কাকা আর ক'দিন পরেই স্ট্যান্ডের জমি-উঠোন থেকে স্রেফ একটা বিন্দু হয়ে যাবে। তখন বলতে হবে বাস্পট। তা চ্যাংরাবান্ধার মতো এমন জরুরি জায়গায় এভাবে বাস স্ট্যান্ড চুরি হচ্ছে, কেউ দেখছে নাকো? নাকি ভাইদের দলবল গম্মেন্টের লোকজনদের বলে দিয়েছে না দেখতে? দেখিস বাপ! বাস স্ট্যান্ডের জমি কিন্তু এক কাঠায় হয় না। মেপে কমাস।

কই, না তো

পুজো আসছে— এই আহ্লাদে কোচবিহার জেলার পকেট রুটগুলোয় চাঁদা-বাহিনীর চোখে ঘুম নেই। কত্ত কাজ তাদের! প্রথমে ট্রাক ড্রাইভারকে টর্চ জ্বালিয়ে থামতে বলা হবে। না থামলে রাস্তার মাঝে বাইক সাজিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। তারপর ট্রাক থামলেই ধরিয়ে দিতে হবে চাঁদার রসিদ। নগদ না দিলে ট্রাক আটকে রাখতে হবে। সব মিলিয়ে কাজের অভাব নাইকো। সন্ধে আর ভোরে

পুলিশের যাওয়া-আসা কমে যায় বলে সে সময় কাজের চাপ বাড়ে। কিন্তু পুলিশকে এসব নিয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা কান চুলকে, উদাস মুখে বলছে, 'ট্রাক থামিয়ে চাঁদা আদায়? কম করে দু'শো টাকা চাঁদা? কই, না তো!' আসলে তাদের কাছে কেউ অভিযোগ না জানালে তারা কীভাবে জানবে কত্তা! কেউ তো কমপ্লেনই করেনি! কেন? কেন? আরে, ট্রাকওয়ালারাও তো মানুষ! তারাও তো অনেকরকম 'ইয়ে' টেরাকে করে নিয়ে যান! খামকা পুলিশে খবর দিয়ে নিজেরা জেলে যান কেন! চাঁদাওয়ালারা যে এটা জানে মামা! তাই তো এত আহ্লাদ!

ইলিষ্ট

তারপর তো শুভক্ষণে বোঝাই ট্রাক ঢুকে পড়ল ডুয়ার্সে। বাজার ছেয়ে গেল রাশি রাশি

ইলিশে। খবরটা ছড়াতেই গেরস্তগণ ছুটল মুক্তকচ্ছ হয়ে। আহা! কী আশ্চর্য সময়! হাসিমুখে ইলিশ নিয়ে বসে সার সার বিক্রেতা। তাদের মুখে দাম শুনে অবিশ্বাস্য চোখে চমকাচ্ছে ক্রেতা। যাঁরা প্লাস্টিকের ইলিশ বলে সন্দেহ করছিলেন, তাঁরা সুর বদলালেন, যখন দেখলেন চেনা লোকের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে সেই ভুলে যাওয়া সুবাস। অচিরেই ব্রাত্য হয়ে গেল বাকি মাছের দল। বোরোলির দর গেল কমে। ইলিশকে ইষ্ট ভেবে ক'দিন তোফায় কাটাচ্ছেন ডুয়ার্সের পাবলিক। বন্যায় সেতু উড়ে ট্রেন লাটে। কারও কিছু যায় আসছে না। দুঃখ ভোলাতে এই অবস্থায় ইলিশের বাড়া আর কী হয় কত্তা? শোনেন নাই বুঝি? ডুয়ার্সের বনলতা সেন কী কইসে, শোনেন নাই? পাখির নীড়ের লগে চোখ তুইলা কইসে, 'হিলিশ? এতকাল কোথায় ছিলিস?' (বিঃদ্রঃ- মিডডে মিলেও মিলছে)

বাপৈ

ওরে মামা, কী আয়না! ভাবাই যায় না! দশ হাত দূরে দাঁড়াও, দেখবে তুমি ন্যাংটো। আরেকটু এগিয়ে যাও! দেখবে তোমার কঙ্কাল খাড়া হ্যায়। আরও একটু এগলে দেখবে, আয়নায় কেউ নেই! কাণ্ড দেখে পুলিশও ঘেবড়ে ঘ হয়ে গিয়েছে প্রথমে। তা আয়নার মালিকরা গোড়ায় বলছিল যে, আয়না নাকি আড়াইশো বছরের পুরনো। তারপর কয়েক ডোজ পড়তেই কবুল করে ফেলে খাস খবর। বিশেষ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে ওই আয়নার মতো বস্তুটি। এরপরে পুলিশ কিঞ্চিৎ চিন্তায় পড়ে যায়। এর জন্য কি গ্রেপ্তার করা উচিত?

অতঃপর মালিদের ব্যাগপত্তর হাতাহাতি। যদি কিছু মেলে। মিলল। মেলার ফলে পুলিশের চোখ আবার গোল্লা। ইকীরে! এ যে হাতি কা দাঁত! গজদন্ত পাওয়ার পর আয়নার মালিকদের হাজতে পাঠাতে অবশ্যি সমস্যা হয়নি। কাণ্ড আলিপুরদুয়ারে।

মনে রেখো হে

ছিটমহল বিনিময়ের আগে ওপার থেকে ছেলেমেয়েরা এপারের স্কুলে ভরতি হত। এপারের কাউকে বাবা বানিয়ে করতে হত পড়াশোনা। ফলে অনেক পড়ুয়ারই কাগুজে বাবা আর জৈবিক বাবা আলাদা। এখন তারা পড়েছে গোলমেলে সমস্যায়। ছিট বিনিময়ের কারণে তারা এখন ভারতের নাগরিক। তাই বাবার নাম নিয়ে সমস্যার অন্ত নেই। কাগুজে বাপরাও নাকি আর চাপ বইতে রাজি নয়। ফলে বাপের নাম ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস গম্মেন্ট দিয়েছে। কিন্তু কাকা! ভাবো একবার! পাবলিক বাপের নাম ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলবে, তা কখনও সিনেমাতেও ভেবেছিলে? এই জন্যই তো বেদে বলা হয়েছে, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। কথাটা ফরগেট কোরো না। রিয়্যালে সব কিছুই মে বি হো সকতা।

বেরসিক বিল

পাগলা দেখতে গিয়ে কিছু পাবলিক পাগলা হয়ে যাচ্ছে। না কত্তা! রহস্য করছিনেকো।

রসিক বিলের নাম শুনেছেন তো? সেখানে মিনি জু আছে, জানেন নিশ্চয়ই? সে জু-এ ঘড়িয়াল থাকে, যার একটার নাম পাগলা। তা ভাবুন কত্তা! পাগলার এক লাভার জুটেছে। প্রেম করার জন্য সে ভেসে ভেসে আসে পাগলার কাছে। তারপর যেই দুটো ভবিষ্যতের কথা বলবে, অমনি ঝপাস করে এসে পড়ে ঢিল। হ্যাঁ কত্তা! রেগুলার বেসিসে প্রেমে ডিস্টার্ব করে পাবলিক। ভাবুন তো, কত্তা মা-র সঙ্গে আপনি দু'দণ্ড রহস্যালাপ করবেন বলে বসেছেন আর বাঁদরগুলো ঢেলা মারতে শুরু করল! ঢিল খেয়ে পাগলার ভ্যালেন্টাইন সেই যে ভেগে যায়, আর আসে না। আরে, পয়সা খচ্চা করে প্রেম দেখতে এসেছিস, তা দেখ। খামকা ঢিলাচ্ছিস কেন? আরও তো কত লোক দেখে, তারা যদি এবার তোদের ঢিলায়, তখন?

জেনে নিন

ফাঁসিদেওয়াতে খুব সাইকেল ফলেছে। এত ফলেছে যে দাম প্রায় অর্ধেক। চার-পাঁচশো দিলেই পাওয়া যাচ্ছে প্রায় নতুন সাইকেল। তা এত সাইকেল যে ফলছে, তার বীজ পাওয়া গেল কোথায়? শোনা যাচ্ছে, সারের দোকানে 'সবুজ সাথী' ব্র্যান্ডের বীজ বিকাচ্ছে চুপিচুপি। সেটাই ফসল হয়ে আসছে পাবলিকের হাতে। হাফ দামে। আসলে, এলাকায় মোটরসাইকেলের অভাব নেই কিনা। পাবলিকও নাকি সব রাজা-উজিরমার্কা। তাই দিদির দেওয়া সবুজ সাইকেল ঘরে রেখে লজ্জা পেতে চাইছেন না। টুপটাপ বেচে দিচ্ছেন সেসব। ফলে কী হয়েছে জানেন? 'সবুজ সাথী'র সাইকেলে চেপে পাবলিক ইশকুল ছাড়া সব জায়গায় যাচ্ছে। এ জন্যই বলছিলাম যে, সাইকেলের চাষ খুব ভাল হচ্ছে সেখানে। উচ্চফলনশীল সাইকেল আপনি সেখানেই পাবেন। জেনে নিয়ে নোট করে ফেলুন।

টুক্রাণু

কালচিনিতে গ্রেপ্তার তিরিশ কেজির খোকা অজগর। মহালয়ার আগেই নাকি পাবলিকের ফুটপাথ পাবলিককে ফিরিয়ে দেবেই দেবে জলপাইগুড়ি পুরসভা। কোচবিহারের পুজোর বাজার জমলেই বৃষ্টি নামছে আর লাইট চলে যাচ্ছে। ছাগল নিয়ে যুদ্ধ করে মালদায় সাত জনতা হাসপাতালে, যদিও ছাগল অক্ষত। দিনহাটায় মিডডে মিলে ইলিশ মাছ। ময়নাগুড়িতে তিনটে ক্লাব এক হয়ে পুজো করছে। মা আসছেন, তার আগে বাঁদররা নিয়মমতো চলে এসেছে মালবাজারে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তুফানগঞ্জ রাজ্যে ফার্স্ট হল। খাগড়াবাড়িতে কারা জানি পেট্রোল পাম্পের সিন্দুক কেটে ফাঁক করে দিয়েছে। এমন নয় যে, ডুয়ার্সের গুন্ডা হাতিরা কিছু করছে না। স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটা বোধহয় ইয়েতিরা রাগ করে খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে বাতাবাড়িতে এবং গমেন্ট তা জানে না। ডুয়ার্সে পুজো প্রস্তুতি তুঙ্গে, কারণ মা রেলে আসছেন না।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)
৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)
৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি)
৮৬০৯০৮৮৯০৭
কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA

মা আসছেন, শিউলি ভোরে
শঙ্খ বাজুক ঘরে ঘরে

এসো এসো
আমার ঘরে এসো...
এই বাংলায়

Welcome to Bengal
Welcome to our home

শারদীয়ার শুভেচ্ছা

WEST BENGAL TOURISM
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন চেহারায় বাংলা

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-12 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

Adventure Sports first time ever at any eco-resort in Dooars

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;

Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9474904461, 9002722699

Mystic Murti mesmerises over Gorumara where luxury meets excitement

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.